প্রকাশক :
শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানী
১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫ ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ভূমিকা

দেশের সহিত সম্যক পরিচয় করাইয়া দেওয়াই বর্ত্তমান ভূগোল বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা যে শহরে বাস করি বা যে জেলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশী, সেই শহর ও সেই জেলার মধ্য দিয়াই সারা দেশকে ভালবাসিতে পারা যায়, এ সত্য ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, আমেরিকান ও রাশিয়ানরা আজ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সেই জন্য তাঁহাদের দেশের প্রত্যেক বড় বড় শহরের ও জেলার সচিত্র ভৌগোলিক কাহিনী রচিত হইয়াছে। শহরের ও জেলার নদ নদীর বিষয়, ভূমির ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা ঐ সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকায় গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলি জনসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারেন, এবং গভর্ণমেন্ট যাহাতে নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত এই ধরণের কোন পুস্তক লিখিত হয় নাই। পরাধীন ভারতের শহর বা জেলা উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সমস্যা-প্রদেশ বলা হইয়া থাকে, এবং এই প্রদেশের ২৪ পরগণা জেলার সমস্যার অন্ত নাই। কলিকাতা শহরের ত' কথাই নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে ভৌগোলিক গবেষণা করা হইতেছে এবং ইংরাজীতে আমার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ **Land utilization in 24 Parganas, Bengal** কয়েক বৎসর পূর্ব্বে **B C Law Volume Part II** পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত প্রবন্ধটি পরে ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (**Calcutta Geographical Society—Publication No. 6**)। এই পুস্তকটিকে এক হিসাবে উহারই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বঙ্গ-বিভাগের ফলে যশোর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা অঞ্চল ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত

হইয়াছে এবং সমগ্র জেলাটি এক সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে; কাজেই নূতন করিয়া বহু বিষয় এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি, এবং কলিকাতা ও সুন্দরবন সম্বন্ধে নূতন দুইটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ব্যবহৃত চিত্র ও মানচিত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের মানচিত্র অঙ্কন কক্ষে শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত হইয়াছে। কলিকাতার ফটোচিত্রগুলি এই পুস্তকের জন্য নূতন করিয়া তুলিয়াছি; ফটো তোলার বিষয়ে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও শ্রীবিমলকুমার আচার্য্য অগ্রণী না হইলে ২৪ পরগণা জেলার ও কলিকাতার বহু ছবি দেওয়া সম্ভবপর হইত না। কলিকাতা সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট রেশনিং ডিপার্টমেণ্ট, ডাইরেক্টরেট অব ট্রান্সপোর্টেশন, কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী, বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট হইতে পাওয়া গিয়াছে। সিটি বুক কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সেনেট হাউস
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

(মানচিত্র)

(তালিকা)

(ফটোচিত্র)

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৪ পরগণার পত্তন ও বৈশিষ্ট্য—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গাংগেয় বদ্বীপে নিজশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে ২৪ পরগণা জেলার পত্তন হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নির্দিষ্ট রাজস্বের পরিবর্তে ৮৮২ বর্গমাইল ভূখণ্ড অর্থাৎ এই জেলার বর্তমান আয়তনের প্রায় ৬ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ভূমির জমিদারী লাভ করিতে সমর্থ হয়। নবাব জাফর আলি খান কোম্পানীকে কলিকাতা-সহ এই ভূখণ্ডের জমিদারী সত্ব মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই ভূভাগ ২৪টি মহলে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই হইতেই এই জেলার নাম ২৪ পরগণা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সন্নিকটবর্তী নদীয়া ও যশোহর জেলা হইতে আরও কয়েকটি পরগণা ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং শাসনের সুবিধার জন্য কলিকাতা নগরীকে ২৪ পরগণা হইতে পৃথক করা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই ২৪ পরগণা জেলার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। বঙ্গ-ভঙ্গের পর এই জেলার সামরিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ ইহার পূর্ব প্রান্তে সম্প্রতি একটি

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভূভাগ গাংগেয় বদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অধিকার করিয়া আছে। ৮৮° হইতে ৮৯° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১° ৩০′ মিঃ হইতে ২৩° ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে ইহার অবস্থিতি। বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তর ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ গাংগেয় সমতল ভূমিতে যাইবার প্রধান রেল, রাস্তা ও জলপথ ইহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণা জেলা উত্তর দিকে প্রস্থে ৩৬ মাইল এবং দক্ষিণ দিকে ইহার প্রায় দ্বিগুণ। সুন্দরবনে সংরক্ষিত অরণ্যাণী ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত অঞ্চলসহ ইহার আয়তন ৪৮৫৬ বর্গ মাইল।* কিন্তু অদ্যাবধি ইহার একতৃতীয়াংশ সুন্দরবনের নিবিড় বনরাজির দ্বারা আচ্ছাদিত। এই জেলার তিনদিকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বর্তমান। দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর; পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে ইছামতী—কালিন্দী ও হুগলী নদী এই জেলাকে বেষ্টন করিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উত্তরস্থ সীমারেখা কোন নদী বা নালা অনুসরণ করিয়া টানা হয় নাই, তবে ইহার উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট জলা দেখা যায়। চতুঃপার্শ্বস্থ জেলাগুলির—নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের সহিত ২৪ পরগণার বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কারণ প্রায় সর্বত্রই একই প্রকারের ভূ-প্রকৃতি, জল বায়ু, ও ভূমি-ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে।

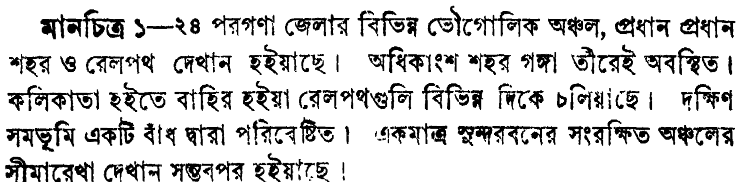
---

* ২৪ পরগণার ল্যাণ্ড সেট্‌লমেণ্ট (১৯২৪-৩৩) রিপোর্ট অনুসারে। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে আয়তন ৩,৬৯৬ বর্গমাইল।

ভূ-প্রকৃতি ও বিভিন্ন অঞ্চল—

সুদীর্ঘ তটরেখা যুক্ত বদ্বীপের বন্ধুরতা কখনই মৃদু না হইয়া পারে না। সেইজন্য ২৪ পরগণা জেলা এক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, যদিও জেলার প্রায় সর্বত্র ইহার একটু আধটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার কোন সমোন্নতি রেখাযুক্ত মানচিত্র (contour map) তৈয়ারী করা হয় নাই; কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের উচ্চস্থান নির্দেশক কয়েকটি চিহ্নের (spot height) সাহায্যে ভূমি কোথায় উঁচু ও কোথায় নীচু তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র অঞ্চলটি একটি বিরাট সমভূমিরূপে ক্রমশ ঢালু হইয়া সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার প্রায় সর্বত্র রেলপথ বা বাঁধান বড় রাস্তা অথবা নদীর বাঁধ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের হাত হইতে কর্ষণযোগ্য নিম্নভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি নূতন বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ভূখণ্ডের উত্তর অঞ্চলের জলাকীর্ণ স্থানগুলি ছোট ছোট অগভীর হ্রদে পরিপূর্ণ। পলিমাটি পড়িয়া এই হ্রদগুলি ক্রমশ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। জেলার সমগ্র ভূপৃষ্ঠ, এমনকি, রেলের বাঁধগুলির উচ্চতা কোথাও ৩০ ফুটের অধিক নহে।

ভূপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশক উচ্চতা, ইছাপুরের ১২ মাইল পশ্চিমে বীরা গ্রামে ২৮ ফুট চিহ্নিত রহিয়াছে। এই অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ঢাল (gradient) অতি সামান্য;—প্রতি মাইলে দুই ইঞ্চিরও কম। বীরা গ্রামের ১১ মাইল উত্তর-পূর্বে বারঘোমের নিকটে আর একটি ২৪ ফুট উচ্চ ভূমি



মানচিত্র ১—২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল, প্রধান প্রধান শহর ও রেলপথ দেখান হইয়াছে। অধিকাংশ শহর গঙ্গা তীরেই অবস্থিত। কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া রেলপথগুলি বিভিন্ন দিকে চলিয়াছে। দক্ষিণ সমভূমি একটি বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত। একমাত্র সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চলের সীমারেখা দেখান সম্ভবপর হইয়াছে।

আছে। উহা উত্তর দিকে ঢালু হইয়া এক নীচু জলাভূমিতে মিলিত হইয়াছে। পদ্মা* একটি বিরাট বাঁক সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে এবং ক্রমে এই নিম্নভূমির মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরে আমরা নিম্নলিখিত ভূ-গঠন দেখিতে পাই। প্রথমত হুগলী নদীর তীর ধরিয়া একটি সমভূমি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার নাম হুগলী তট দেওয়া যাইতে পারে। ইহা পূর্ব দিকে একটি প্রধান রেলপথের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই তটভূমি জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সমভূমি অপেক্ষা অধিকতর ঢালু; কাজেই জল নিঃসারণের ব্যবস্থা এখানে অপেক্ষাকৃত ভাল। এই কারণেই অতীতে ইহা মনুষ্যের বাসোপযোগী সুন্দর স্থান যোগাইয়াছে এবং বর্তমানে বিপুল জন বহুল নগর সমূহে পরিণত হইয়াছে (মানচিত্র ১)। উত্তর অংশে এই তটভূমি ঢালু হইয়া একটি বিশাল জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। এই জলাভূমিতে কোথাও গভীর জল, আবার কোথাও অগভীর জল দেখা যায়। রেলে বা মোটরে উত্তর দিক হইতে কলিকাতা আসিবার সময় কাঁকিনাড়া রেল ষ্টেশনের নিকট প্রথম এই জলার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়। জলাভূমির পশ্চিম সীমায় রেলের বাঁধের সন্নিহিত ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রতি মাইলে একফুট ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে।

ইহার আরও পূর্ব্বে সুঁতীনদীর গতিপথ হইতে অপর একটি ডেঙ্গা জমি পূর্ব দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমে

* ২৪ পরগণা জেলায় একটি ছোট নদীর নাম পদ্মা।

ইহা প্রায় ৫ মাইল চওড়া। এখানে জমি পশ্চিম দিকে ঢালু। ইহাকে সুঁতীডেঙ্গা বলা হয়।

সুঁতীডেঙ্গার পূর্বে, আরও একটি প্রায় ১০০ বর্গমাইলের বেনো জমি আছে—পদ্মার বেনো জমি। এই অংশটি পদ্মার মন্থর জলরাশির একটি প্রশস্ত বাঁকের দ্বারা প্রায় আবদ্ধ। এই অঞ্চলে বহু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হ্রদ উক্ত নদীর সমান্তরালে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি দেখিলে মনে হয় যে, উহাদের উৎপত্তির সহিত নদীর পুনঃ পুনঃ পশ্চিমদিকে গতি পরিবর্তনের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। জমি ধীরে ধীরে বসিয়া যাওয়ার ফলে নদী যতবার পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে, ততবার ইহার পরিত্যক্ত গতিপথে এক একটি হ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে। উপরোক্ত বেনো জমির পূর্বদিকে আর একটি ডেঙ্গা জমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **ইছামতী তট** বলা যাইতে পারে। এই তটভূমি পূর্বদিকে ধীরে ধীরে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইছামতী তটের পূর্বদিকে বল্লী বিল নামে একটি জলাভূমি আছে। ইহা এক সময়ে আরও দক্ষিণে অবস্থিত দাঁতভাঙ্গা জলাভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল। হুগলী তটের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে জেলার পূর্ব সীমা পর্যন্ত ডেঙ্গা ও বেনোজমি গুলিকে একত্রে **আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর** সমভূমি বলা যাইতে পারে।

বারাসাত বসিরহাট অঞ্চলে আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সমভূমি রহিয়াছে। এই সমভূমি গুলির মধ্যদিয়া নির্মিত পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রসারিত বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলের বাঁধ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রেল বাঁধের উপর ভূমির

উচ্চতা পশ্চিমে ২৮ ফুট এবং পূর্বে ২৩ ফুটের মধ্যে, কিন্তু আশেপাশের উচ্চতা মাত্র ১০ ফুট। জেলার উত্তরাংশের মত ক্রমাগত উত্তর দক্ষিণে নদী ও পলিপূর্ণ প্রণালীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের পরস্পর সংলগ্ন প্রান্তর গুলির মধ্য দিয়া একটি রেলপথ ও বাঁধান রাস্তা গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই সমভূমি গুলির দক্ষিণ প্রান্তে কতকগুলি জলাভূমি আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমে ভুবনপুরের জলা অত্যন্ত গভীর এবং বৎসরের প্রায় সর্বসময়েই জলে পরিপূর্ণ থাকে। পূর্ব দিকের জলাগুলি, এমনকি পদ্মা বিলও ইহার অপেক্ষা অনেক অগভীর।

কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর অতীত ও বর্তমান গতিপথের মধ্যে এই জেলার সর্বাপেক্ষা উর্বর কর্ষণযোগ্য ভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলকে দক্ষিণ সমভূমি বলা যাইতে পারে। কয়েকটি রেলপথ এবং পাকা রাস্তা ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। কালিঘাট-ফল্‌তা রেল লাইনের দুই পার্শ্বে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা দক্ষিণে ১২ ফুট ও উত্তরে ১৫ ফুট। রেল বাঁধের পশ্চিমে হুগলী নদীর দিকে জমি প্রায় পাঁচ ফুট নামিয়া গিয়াছে। এই স্থানকে বজবজ বিষ্ণুপুর প্রান্তর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আরও দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হুগলী ও দামোদর সঙ্গমের ঠিক নীচে এই জমির উচ্চতা কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হুগলী নদীর নিম্ন প্রবাহে প্রথম যে বড় নদী ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহা হইল দামোদর। কতকটা সেই কারণেই হুগলী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত বেনো জমির উচ্চতা উত্তরের বেনো

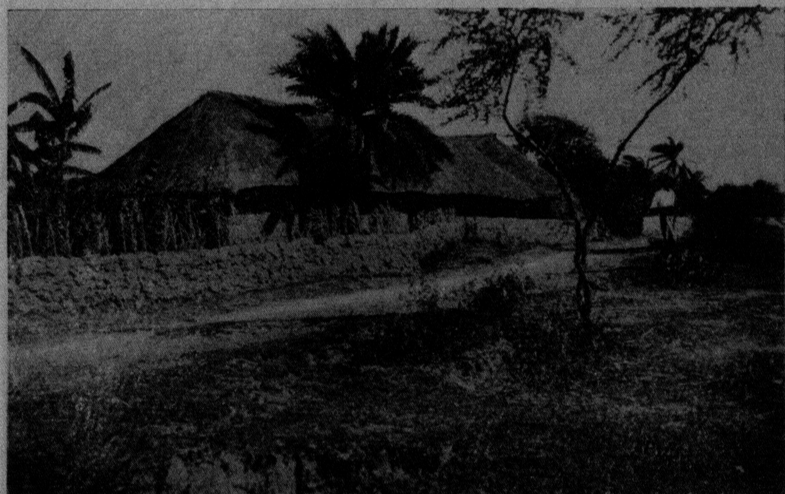
জমির উচ্চতা অপেক্ষা অধিক। প্রথম সঙ্গমস্থলের প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ হুগলী নদীতে মিলিত হইয়াছে। রূপ-নারায়ণ ও দামোদরের মিলিত চেষ্টায় বেনো জমির উচ্চতা আরও বর্ধিত হইয়াছে। এই স্থানের উচ্চতা ২০ ফুটেরও অধিক। এই উচ্চভূমিকে কুলপী-ডায়মণ্ডহারবার-ফলতা ডেঙ্গা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই ভূভাগের পূর্ব প্রান্ত দিয়া এক সময় যে গঙ্গা প্রবাহিত হইত তাহা এখনও বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তখন গঙ্গাতটে জনবহুল বহু গ্রামও সহর বিরাজ করিত। গঙ্গা সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের প্রাচীন গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রাচীন গঙ্গা-তটকে বারুইপুর জয়নগর মরাগাং নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(এই জেলার অবশিষ্ট ভূ-ভাগ প্রাচীন বা বর্তমান সুন্দরবনের অংশবিশেষ। এখানকার বিশাল জলাভূমির সহিত বঙ্গোপসাগরের জলের যোগাযোগ আছে। ভূমি উন্নয়নের তারতম্য হিসাবে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—(১) প্রাচীন সুন্দরবন। (২) আবাদী সুন্দরবন। (৩) সুন্দরবন জঙ্গল। বর্তমান সুন্দরবনের উত্তরাংশে বহুদিন পূর্বে লোকের বসবাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহা যে কখনও সুন্দরবনের অংশ ছিল তাহা আজ আর বুঝিতে পারা যায় না। তবে গ্রাম স্থাপনের উপযোগী ডেঙ্গা জমির অভাবে গ্রামগুলি এখানে দূরে দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিমাংশে অনেক আগেই জনসাধারণের বসবাস আরম্ভ হইয়াছিল এবং



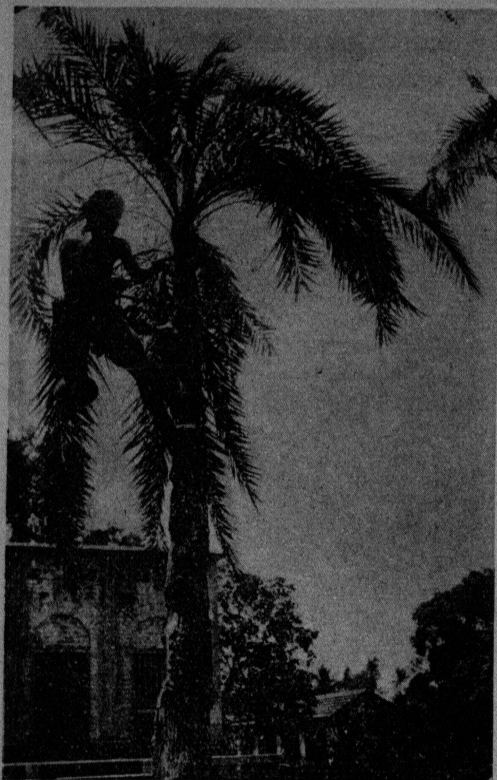
ফটোচিত্র ৩—দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলের একটি গ্রাম্য দৃশ্য

[এই গ্রামটি মগরাহাটের একটু উত্তরে অবস্থিত ; বাড়ীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মাটির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গ্রামের সন্নিকটে খেজুর, তাল, সুপারী ও তেঁতুল গাছ এবং দূরে বাঁশঝাড় দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা—৯৯)]



ফটোচিত্র ৪—আবাদী স্থন্দরবন অঞ্চলের একটি গ্রাম

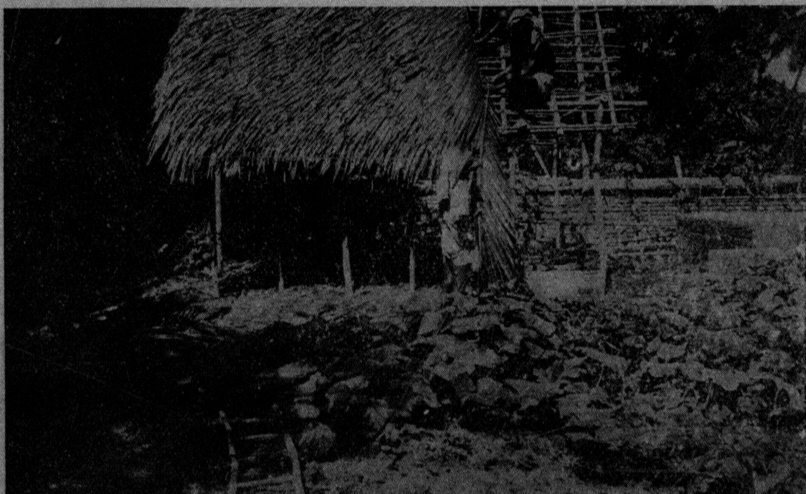
[এই গ্রামগুলি স্থন্দর পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে ; গ্রামের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলের মত ঘন গাছপালা দেখা যায় না। (পৃষ্ঠা—১১১)]



ফটোচিত্র ৫—

বারাসাত-বসিরহাট সমভূমি অঞ্চলে খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ

[এরূপ খেজুর গাছ ও তাহা হইতে রস সংগ্রহ জেলার প্রায় সর্বত্র দেখা যায়; খেজুর গাছের সম্যক যত্ন লইলে ইহা হইতে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। (পৃষ্ঠা ৯৫)]



ফটোচিত্র ৬—আমডাঙ্গা-স্বরূপনগরে গোলপাতা দিয়া ঘর ছাওয়া

[এই ভাবে ঘরামীরা জেলার প্রায় সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে ঘর ছায়। ঘর ছাইবার বাঁশ সাধারণত গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাঁশঝাড় হইতে, এবং গোলপাতা সুন্দরবন হইতে আনা হয়। (পৃষ্ঠা—১০৬)]

সেই কারণেই অধিক সংখ্যক গ্রাম এখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পূর্বাংশের নাম হাসনাবাদ সমভূমি এবং পশ্চিমাংশের নাম ভাঙ্গর-রাজার হাট সমভূমি। এই দুই সমভূমির মধ্যে হারোয়া সমভূমি অবস্থিত। কলিকাতার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত 'লেক' বা ভেরী, এক সময় সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিমে সাগর ও কাকদ্বীপে এবং পুর্বে ক্যানিং ও সন্দেশখালি অঞ্চলে সুন্দরবন উন্নয়নের বহুচিহ্ন পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কূয়ার লবণাক্ত জল, দূরে দূরে ঘরবাড়ী, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী-নালা, দিগ্‌দিগন্ত প্রসারী প্রান্তররাজি, ইতস্তত বিস্তৃত সুন্দরবনের উদ্ভিজ্জ, উপরোক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।

সুন্দরবনের অবশিষ্ট অংশ এখনও উন্নয়নের অপেক্ষায় আছে। ইহা আজও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সংরক্ষিত সুন্দরবনের জঙ্গল প্রায় ১৬৩০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র জেলার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে।* তটভূমির একটু দূরে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এইগুলি এখনও মূল স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হয় নাই। ইহারা হুগলী, ঠাকুরাণ, মাতলা, ও সুন্দরবনের অন্যান্য নদীর মোহনায় অবস্থিত।

ইহা ছাড়া আরও ১,২০৭ বর্গমাইল বন চাষের জন্য লিজ দেওয়া আছে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নদনদী—বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত উন্নতি

গঙ্গা (হুগলী) এবং ইছামতী এই জেলার দুইটি প্রধান নদী ; ইহারা যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে (মানচিত্র ২)। জলনিঃসারণের দিক হইতে হুগলী নদীর গুরুত্ব খুবই কম; বিশেষ ভাবে উত্তর দিকে। রাস্তাঘাট ও বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া হুগলী নদীকে জেলা হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরে অবশ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাল হুগলী নদীর সহিত জেলার আভ্যন্তরিক ভাগের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু পলিমাটি পড়িয়া তাহাদের মুখগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্তরে মাত্র মথুরা বিলের জল বাঘেরখালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই খালটিও প্রায় মজিয়া আসিয়াছে এবং কচুরীপানায় একেবারে পরিপূর্ণ। ২৪ পরগণার যে নদীগুলি আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর এবং বারাসাত-বসিরহাট সমভূমির জল নিঃসারণের কাজ করিত, তাহাদেরও প্রায় একই অবস্থা। সুঁতী নদী এখন ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত মন্থরগতিতে ভুবনপুরের জলায় গিয়া মিশিয়াছে। ২৪ পরগণার উত্তরে প্রবাহিত অপর দুইটি নদী —পদ্মা ও যমুনা যথেষ্ট অবনতির পথে। এই দুইটি নদী ভারতের দুইটি প্রধান নদীর নামানুসারে রাখা হইয়াছিল।

ইহাতেই বুঝা যায় যে ২৪ পরগণার এই নদী দুইটি এক কালে এই জেলার মধ্যে গৌরবের বস্তু ছিল। নদীর দুই কূল পরস্পর হইতে বহুদূরে, কিন্তু বর্তমান নদী প্রাচীন নদী গর্ভের অল্প একটু স্থান অধিকার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে নদীর পরমায়ু ক্রমশ ফুরাইয়া আসিতেছে। ত্রিবেণীর কাছে যমুনা গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া আসে। পরে উহা নদীয়া ও যশোহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোবরডাঙ্গার একটু পশ্চিমে ২৪পরগণায় প্রবেশ করে, এবং আঁকিয়া বাঁকিয়া কয়েক মাইল চলার পর স্বরূপনগরের কিছু উত্তরে ইছামতীর সহিত মিলিত হয়। যমুনা নদী আজ মৃতপ্রায়; ইহার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। পদ্মার গতি আরও মন্থর। স্থানে স্থানে নদীগর্ভ ভরাট হইয়া যাওয়ায় পদ্মার উৎপত্তিস্থল মানচিত্রে সঠিকভাবে দেখান সম্ভবপর নহে। প্রথমত ইহা দক্ষিণবাহিনী; পরে দেগঙ্গা থানায় একটি প্রকাণ্ড বাঁক সৃষ্টি করিয়া ইহা উত্তরবাহিনী হইয়া যায়, এবং স্বরূপনগর থানার চারঘাটের কাছে যমুনায় আসিয়া পড়ে।

পদ্মার প্রাচীন গতিপথ এখন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মরাগাঙে পরিণত হইয়াছে। ইহারা এখনও পদ্মা বিল নামে পরিচিত।

এই স্বাভাবিক জলনিঃসারণের পথগুলি পঙ্কাবৃত হইয়া অকেজো হইয়া যাওয়ায় ২৪ পরগণার উত্তরাংশে বহু জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে হাবড়া, দেগঙ্গা ও বাদুরিয়া থানার বহু কৃষিজমি একেবারেই উৎপাদন-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্তু কচুরী-পানার জন্য এখানকার মন্থর

মানচিত্র ২—২৪ পরগণার প্রধান প্রধান নদী, খাল ও বিল দেখান হইয়াছে। উত্তরে অবস্থিত যমুনা, পদ্মা ও বিদ্যাধরী আজ মৃতপ্রায়।

মিষ্ট জলের বিল—(ট)—মথুরাপুর; (ক)—বাবিতি; (খ)—নাংলা; (গ)—বল্লী।

নোনা জলের বিল—(ঘ) ধাপা; (চ)—ভুবনপুর; (ছ)—পাচিলবারিয়া; (জ)—পদ্মা; (ঝ)—পায়না।

কলিকাতার দক্ষিণে পিয়ালী নদী মৃতপ্রায়; কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া তিনটি প্রধান জলপথ পূর্ববঙ্গের দিকে গিয়াছে।

জলস্রোত, জলাভূমি ও পুকুরগুলিকে মৎস্য চাষের জন্য উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। জল-নিঃসারণের অব্যবস্থাই এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের অবনতির অন্যতম কারণ।

জেলার এই অঞ্চলে ইছামতীই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নদী, যদিও ইহার প্রভাব পূর্বপ্রান্তেই সীমাবদ্ধ। উত্তরে গোবরা এবং দক্ষিণে বসিরহাটের মধ্যে যদি এই নদীর বাঁকগুলি কাটিয়া সোজা করিতে পারা যায় তবে ইহা একটি প্রধান জলপথে পরিণত হইতে পারে, এবং বর্ষার অতিরিক্ত জল সহজে ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই দুইটি স্থানের দূরত্ব মাত্র ১৬ মাইল, কিন্তু নদীটি আকিয়া বাঁকিয়া চলায় ইহার দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ৪৩ মাইল। নদীর আশে পাশে বহু মরাগাং দেখিতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বল্লীজলার মধ্য দিয়া একটি খাল খনন করিয়া সোনাই নদীকে ইছামতীর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পশ্চিমে বারিতি, মধ্যে নাংলা, এবং পূর্বে বল্লী এই অঞ্চলের বিশিষ্ট বিল। উক্ত বিল অঞ্চলের প্রায় ৬৩ বর্গমাইল স্থানে গভীর জল বৎসরের সকল সময় থাকে। ইহা অনায়াসে মাছ ধরার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করা যাইতে পারে। বারাসাত-বসিরহাট সমভূমির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জলাগুলির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কলিকাতার পূর্ব প্রান্তস্থ নোনাজলের বিলগুলি ইহাদেরই অংশবিশেষ। জোয়ারের সময় এই

বিলগুলির মধ্যে সমুদ্রের নোনা জল প্রবেশ করে। এই অঞ্চলে এবং আরও দক্ষিণে বিদ্যাধরী এক সময় একটি প্রধান নদী ছিল। এই নদীটি এখন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। একটি অংশ জেলার পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া রায়মঙ্গল নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু অপর যে অংশ কলিকাতার নিকট দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া মাতলা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার অবস্থা আজ শোচনীয়।

প্রাচীন সুন্দরবনের সমভূমিতেও বর্ষার জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না। নদী ও খালের অভাবে যে জল বাহির হয় না, তাহা নহে। ঐ অঞ্চলে, বিশেষত পূর্বভাগে হারোয়া ও হাসনাবাদ অঞ্চলে, বহু সংখ্যক খাল ও নদীর গর্ভে—হারোয়া গাং, বিদ্যাধরী, পিয়ালী ইত্যাদিতে পলি মাটি জমিয়া নদীগুলিকে আশেপাশের জমি হইতে অনেক উপরে উঠাইয়া দিয়াছে। কাজেই, নদীর উভয় পার্শ্বে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে নদীর নোনা জল নিম্নের আবাদী জমিতে প্রবেশ করিতে না পারে। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল হইলেও নদীর যে আর একটি প্রধান কার্য জল নিকাশ, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ভাঙ্গর ও রাজারহাট অঞ্চলে একমাত্র বিদ্যাধরী ছাড়া আর এমন কোন নদী বা স্বাভাবিক নালা নাই যাহার দ্বারা জল নিকাশ হইতে পারে। তবে প্রধান কয়েকটি জলপথ—কৃষ্ণপুর খাল, ভাঙ্গর কাটা-খাল ও বিদ্যাধরী খাল, এই প্রদেশের মধ্য দিয়া কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ

রাখিয়াছে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে এই খালগুলির মধ্যে বাহিরের জল আনিয়া ফেলার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সকল দিক দিয়াই সুবিধা হইত। কিন্তু খালের উভয় পার্শ্বের জমি একে নীচু, তাহার উপর চার ফুট উঁচু বাঁধ খালের ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে; ফলে চতুষ্পার্শ্বের বৃষ্টির জল খালের মধ্যে আসিবার কোন উপায় নাই। বাঁধের মাঝে মাঝে জল নিঃসারণের দ্বার থাকা উচিত ছিল, তাহাও নাই। খাল কাটার পর হইতেই আবার নদী মজিতে আরম্ভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যাধরী নদী ও কৃষ্ণপুরের খালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই খাল কাটিবার পর হইতেই বিদ্যাধরীর অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইয়া যাইতেছে। বিদ্যাধরী কলিকাতা মহানগরীর ময়লা জল ও বৃষ্টির জল নিঃসারণের কাজ করিয়া থাকে। প্রবল বৃষ্টি-পাতের পর, প্রায়ই দেখা যায় ঠন্ঠনে কালীবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে রাস্তায় জল জমিয়া ট্রাম চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বিদ্যাধরীর আজ আর অতিরিক্ত জলরাশিকে বহন করিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বামনঘাটা হইতে কুলটি পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হইয়াছে।

কলিকাতার দক্ষিণে, বজবজ-বিষ্ণুপুর, কুলপী-ডায়মণ্ডহারবার-ফলতা এবং বারুইপুর-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের জল নিঃসারণের ব্যবস্থা ২৪ পরগণার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উন্নত ধরণের। স্বাভাবিক নদী-নালার দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয় নাই, পরন্তু জল নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যেই বহু খাল খনন করা হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে মগরাহাট জলনিঃসারণের পরিকল্পনাই আধুনিকতম। চরাইল খাল, বজবজ-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত বৃষ্টির জলকে বজবজের সন্নিকটে হুগলী নদীতে নিঃসারিত করে। এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রান্তরের জলরাশিকে কাওড়াপুকুর খাল, সূর্যপুর খাল ও মগরা খাল দ্বারা হুগলী নদীতে ডায়মণ্ড-হারবারের প্রধান জলদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করান হয়। কুলপী খাল, কুলপী অঞ্চলের জলরাশিকে কুলপী গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে হুগলী নদীতে প্রবাহিত করে। দক্ষিণ অঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত ধরিয়া গঙ্গার প্রাচীন শুষ্ক নদীগর্ভ চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম দিকে গতি পরিবর্তন করিবার ফলে এই অঞ্চলের বহু স্থান, কৃত্রিম খাল খনন করাইবার পূর্ব পর্যন্ত বদ্ধ জলায় পরিণত ছিল। বারুইপুরের পূর্ব প্রান্ত দিয়া ক্ষীণকায়া পিয়ালী নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাকেও পুনর্জীবিত করা একান্ত আবশ্যক।

সুন্দরবন অঞ্চল বহু বিরাট স্রোতস্বিনী নদীতে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের খাড়িগুলি এই প্রদেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। এখানে নদীগুলি একই পথে প্রবাহিত না হইয়া বহুমুখী হইয়া গিয়াছে এবং বাধা না পাইলে ধীরে ধীরে আশেপাশের জমিকে সমুদ্রতট হইতে উপরে উঠাইয়া দেওয়ার কার্যে ব্যাপৃত থাকে। ২৪ পরগণার সমুদ্রোপকূল ভাগে হুগলী ও তাহার উপশাখা মুড়ীগঙ্গা*, সপ্তমুখী* ঠাকুরাণ অথবা জামিরা, মাতলা, গোসাবা, হরিভাঙ্গা এবং রায়মঙ্গল অবস্থিত।

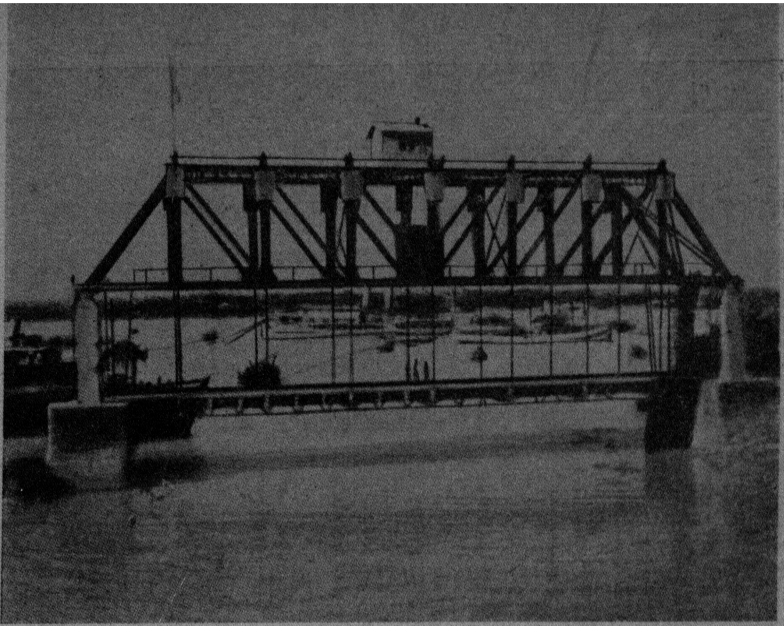
*মুড়ীগঙ্গা এবং সপ্তমুখীর উপরিভাগ আজ মৃতপ্রায়

শেষোক্ত নদীটির মোহানা এখন খুলনা জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। প্রধান প্রধান নদীগুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইলেও তাহাদের শাখা প্রশাখা পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত। এই

মানচিত্র ৩—বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সাগরদ্বীপের সন্নিহিত কাকদ্বীপ ও দিগম্বরপুর অঞ্চলে ছোট বড় সকল নদীই বাঁধে ঘেরা

কারণে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে জলপথে আসা সহজ হইয়াছে। এই নদীগুলি প্রায় ৩০০ বর্গমাইল স্থান অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলের এক চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করিয়া

আছে, কিন্তু পলিমাটির দ্বারা ভরাট হইবার পূর্বেই সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়া দেওয়ার ফলে নদীগু'লর স্বাভা'বিক কার্যে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। যখন সুন্দরবনের জমি আবাদের জন্য কিস্তীবন্দীতে দেওয়া হইয়াছিল, তখন দেশের শাসকেরা উপযুক্ত সময়ের পূবে' সুন্দরবন উন্নয়নের ভাবী বিপদ সম্পর্কে সচেতন হইতে পারেন নাই। এখানকার জমির উচ্চতা জোয়ারের জলের উচ্চতা অপেক্ষা কম থাকায় জমিদারদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সমুদ্রের নোনা জলের প্রতিরোধ করা। জমির চতুর্দিকে বাঁধ দেওয়া হইত এবং নদীগু'লর কৃত্রিম তীর প্রস্তুত করিয়া নির্দিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এমন কি অত্যন্ত ক্ষুদ্র খাড়িগুলিকেও সুউচ্চ বাঁধ দিয়া আবদ্ধ করা হইয়াছিল (মানচিত্র ৩)। স্বাভাবিক জল প্রবাহের এই প্রতিবন্ধকতার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে নদীর জলের উচ্চতা ভূমির উচ্চতা অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং জল নিঃসারণ ও বাঁধ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে ক্রমশ দুরূহ করিয়া তোলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাতলা নদী সন্নিকটবর্তী ভূভাগের ১০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত, এবং যে কোন মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিরাট প্লাবনের সৃষ্টি করিতে পারে। নদীগর্ভে পলিমাটি জমার ফলে বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই নদীগুলির গভীরতা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। পোর্ট ক্যানিং হইতে জলপথে গোসাবা যাইবার সময় মাতলা নদীকে এবং বিশেষ করিয়া পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হুগলী ও করতাইকে দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়। কোন কোন



ফটোচিত্র ৭—গঙ্গা (হুগলী নদী) ও আদিগঙ্গা

[আদিগঙ্গার উপর কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের রেল চলাচলের জন্য নির্মিত পুলটি চিত্রে দেখা যাইতেছে। দূরে গঙ্গা বক্ষে কয়েকটি জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে। (পৃষ্ঠা ১৮৩)]



ফটোচিত্র ৮—কুলপী খাল ও গঙ্গা

[দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত কুলপী খাল এখানে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। খালের মুখে কয়েকটি নৌকা দাঁড়াইয়া আছে ; দূরে গঙ্গা দেখা যাইতেছে। জোয়ারের জলে খালটি ভরপুর। (পৃষ্ঠা ১৬, ১০১)]



ফটোচিত্র ৯—ইছামতী নদী ও তাহার ভাঙ্গন

[জেলার পূর্ব সীমানা দিয়া ইছামতী প্রবাহিত হইতেছে। নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলার সময় এক পারে ভাঙ্গার আর অপর পারে গড়ার কাজ করিতে থাকে। টাকীর কাছে এই পারটি এখন ভাঙ্গিতেছে; বাঁশের বেড়া দিয়া ভাঙ্গন বন্ধের চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। (পৃষ্ঠা ১৩, ৯৬)]



ফটোচিত্র ১০—মাতলা নদী ও ক্যানিং বন্দর (পোর্ট ক্যানিং)

[মাতলা নদীর একটি বাঁকের উপর ক্যানিং গ্রামটি দেখা যাইতেছে। জ্বালানী কাঠ বোঝাই করিয়া বহু নৌকা সুন্দরবনের জঙ্গল হইতে প্রতিদিন এখানে আসে; এরূপ দুইটি নৌকা নদীতে ভাঁটার জন্য আটকাইয়া রহিয়াছে। (পৃষ্ঠা ১৮, ১০৬)]

ক্ষেত্রে বাঁধগুলি একবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আর সংস্কার করা হয় নাই ; ফলে, বহু কষ্টে উদ্ধারিত কর্ষণযোগ্য ভূমিগুলি পুনরায় জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে করাটিয়া বা কুরিয়াভাঙ্গার সহিত সংযুক্ত পায়না জলাভূমির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২৪ পরগণা জেলার নদনদীগুলির বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদিও প্রকৃতিদত্ত বিশাল নদীগুলি জেলার জল নিঃসারণের এবং চলাচলের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম, তথাপি মানুষের অবহেলার ফলে ২৪পরগণা জেলার অধিকাংশ স্থানে নদী ও নালার অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং কর্ষণযোগ্য জমি ধীরে ধীরে জলাভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

২৪ পরগণার মৃত্তিকা

২৪ পরগণা জেলার মৃত্তিকা কোথাও জলের নীচে ও কোথাও বেনো জমির উপরে সঞ্চিত নদীর তলানি—বালি, পলি ও কর্দম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটবর্তী স্থানে সাধারণত ২০ হইতে ৩০ ফুট মাটির নীচে অবস্থিত স্তরীভূত উদ্ভিদ্ (peat) যখন কোন কারণে ভূপৃষ্ঠের নিকটে আসে, তখন মৃত্তিকার সংগঠনেও সহায়তা করে।

এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের মৃত্তিকা গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল (তালিকা ১)।

তালিকা ১

২৪ পরগণা জেলার কয়েকটি স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলাফল

(শুষ্ক মৃত্তিকার—শতকরা ভাগ দেখান হইয়াছে)

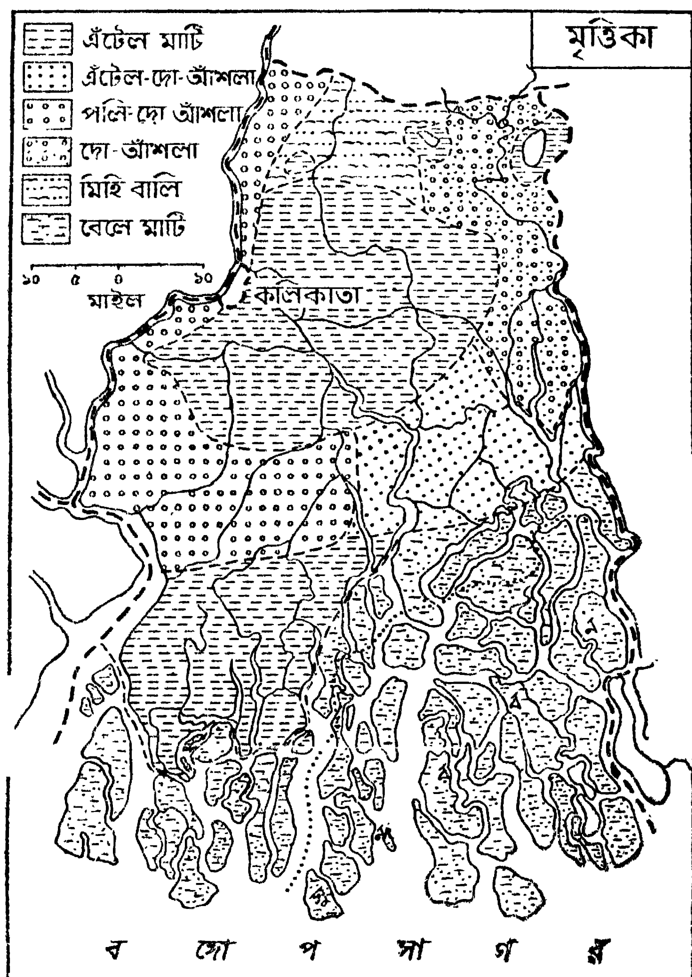
স্থান	জলীয় অংশ	জৈব-পদার্থ	লবণে হ্রাস	মোটা বালি	মিহি বালি	পলি	এঁটেল মাটি	pH সংখ্যা	মৃত্তিকার নাম
হুগলীতট									
(১) দমদম	৪·৪০	৯·৫০	?	০·৬০	২০·৮০	৪৯·৫৪	১৬·৪৬	৮	পলি দোআঁশলা
আমডাঙ্গা স্বরূপনগর সমভূমি									
(২) গোবরডাঙ্গা	১·১৪	৩·৮৫	২·০৪	০·১৪	৫১·০১	১৩·৪০	২৭·০৭	৬·৫	মিহি বালি দোআঁশলা
বারাসাত বসিরহাট সমভূমি									
(৩) দত্তপুকুর	?	৪·১৭	০·২১	০·৩২	৬০·৭৯	১৪·৮৮	৯·৫০	?	মিহি বালি
দক্ষিণ সমভূমি									
(৪) মগরাহাট	২·৯০	৩·৫০	০·৭৫	০·৯৭	১৪·৮৫	৫৩·৭৫	২১·২৫	৭·২	পলি দোআঁশলা
(৫) বারুইপুর	২·৯০	৩·৫০	২·০২	০·৪০	৩২·৪০	২২·৭৫	৩৪·৭৫	৮·৭	এঁটেল দোআঁশলা
প্রাচীন সুন্দরবন									
(৬) ভাঙ্গর	১·৫০	৭·১০	১·৫২	১·৭৫	২৫·১০	২৪·৫০	৩১·৫০	৮·৩	এঁটেল দোআঁশলা
আবাদী সুন্দরবন									
পশ্চিমাংশ									
(৭) কাকদ্বীপ	১·৫৬	৩·০৭	১·৮৫	০·১২	২৫·৮০	১২·৮৫	৫০·২৫	৮·৬	এঁটেল
উত্তরাংশ									
(৮) কুড়িয়াভাঙ্গা	১·৯০	৭·১০	১·৯০	০·৪০	১০·৪২	৪৪·০০	২৯·০০	৬·৫	এঁটেল দোআঁশলা

জেলার উত্তরস্থ সমভূমি অঞ্চলে মিহি বালি বা বেলে-দো-আঁশলা মাটির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরণের মৃত্তিকায় শতকরা ৫০ ভাগ মিহি বালি, ২০ হইতে ৪০ ভাগ পলি ও এঁটেল এবং ৪ ভাগ জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ থাকে। এই মৃত্তিকার pH* সংখ্যা ৬.৫ অর্থাৎ জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম। অত্যধিক পরিমাণে বালি থাকার জন্য এই মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র এবং আমন ধান্য চাষের উপযোগী নয়, কারণ এরূপ জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না। এই ধরণের মৃত্তিকা আউশ ধান, পাট, আলু ও অন্যান্য শাকসব্জী উৎপাদনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

হুগলী এবং ইচ্ছামতীর তটভূমি অর্থাৎ পশ্চিমে হুগলী-তট এবং পূর্বে ইছামতী, বসিরহাট ও হাসনাবাদ সমভূমির মাটি দো-আঁশলা বা পলি মিশ্রিত দো-আঁশলা। ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা এবং মগড়াহাট অঞ্চলের মাটিও ঐ একই প্রকারের। ইহার রং গাঢ় মেটে এবং কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ইহাতে শতকরা কিঞ্চিৎ অধিক ৫০ ভাগ পলি মাটি, প্রায় ২১ ভাগ এঁটেল, ১৫ হইতে ২০ ভাগ বালি বর্তমান। স্থানভেদে জৈব পদার্থের পরিমাণ কোথাও কম, কোথাও বেশী—শতকরা ৩.৫ ভাগ হইতে ৯.৫ ভাগের মধ্যে। ইহার pH সংখ্যা ৭, অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলের মাটি অপেক্ষা কিছু বেশী। অত্যধিক

* pH—হাইড্রোজেন আয়ন মিলন; pH সংখ্যার তারতম্যের উপর মাটির গুণাগুণ নির্ভর করে।

পরিমাণে পলিমাটি থাকায় এই মৃত্তিকার জল ধারণ করিয়া



মানচিত্র ৪—২৪ পরগণার বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা (গঙ্গার তীরবর্তী জমির মাটি কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী)

রাখিবার ক্ষমতা খুব বেশী এবং কাজেই প্রচুর আমনধান

জন্মাইবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দক্ষিণ অঞ্চলের পলিমাটিতে জৈব পদার্থের অংশ অত্যন্ত কম। উপযুক্ত পরিমাণে জৈব বা অন্য প্রকারের সার দিলে এই মৃত্তিকা হইতে আরও অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন সম্ভবপর। দক্ষিণ অঞ্চলে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে অন্য প্রকারের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এঁটেল মাটির পরিমাণ এখানে পলি মাটি অপেক্ষা অধিক এবং বালি ও এঁটেল মাটির পরিমাণ প্রায় সমান সমান। এখানকার মাটির pH সংখ্যা জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য মজা-নদীর গর্ভে স্থানে স্থানে এঁটেল দো-আঁশলা মাটি দেখা যায়। দক্ষিণ অঞ্চলের পূর্বভাগে, বিশেষ করিয়া মাতলা নদীর তটে একধরণের দো-আঁশলা মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাটিতে শতকরা ৩০ ভাগ এঁটেল ও ৪৪ ভাগ পলি এবং অল্প পরিমাণে বালি পাওয়া যায়। খুব সম্ভব জলাভূমির আধিক্যের জন্য pH সংখ্যা অত্যন্ত কম।

কলিকাতার নিকটবর্তী ভাঙ্গর ও হারোয়া অঞ্চলে এবং হুগলীর মুখে কাকদ্বীপের নিকটস্থ নিম্ন জলাভূমিগুলিতে এঁটেল মৃত্তিকার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ এঁটেল ও ২৫ ভাগ মিহি বালি ইহার উপাদান। ইহা যে যথার্থই এঁটেল মাটি তাহা বৃষ্টির পরে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বৃষ্টির পূর্বে খুব শক্ত মাটির ঢেলা ইহার বিশেষত্ব। এই মাটি সহজেই জল ধরিয়া রাখে এবং কৃষি কার্যে ব্যাঘাত ঘটায়। ভাঙ্গর ও হারোয়া অঞ্চলে কিছু পরিমাণে এঁটেল দো-আঁশলা মাটি আছে। প্রাচীন সুন্দরবনে মৃত্তিকা

স্বভাবতই লবণাক্ত কারণ সচ্ছিদ্র মাটির বাঁধগুলির ভিতর দিয়া সমুদ্রের নোনাজল সহজেই প্রবেশ করে। এই জেলার অন্যান্য নিম্নভূমি অঞ্চলেও জোয়ারের সময় মাতলা প্রভৃতি নদী দিয়া সমুদ্রের নোনাজল কৃষি জমির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে এবং যেখানেই বাঁধের অবস্থা খারাপ সেখানেই নোনা মাটির প্রাধান্য দেখা যায়।

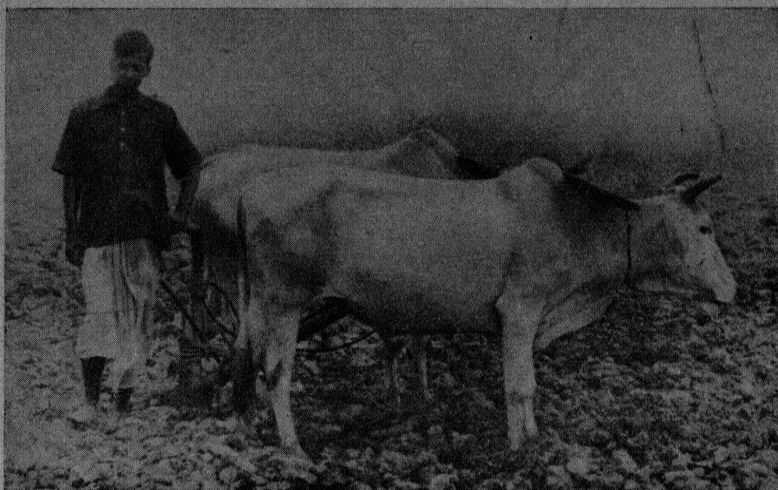
সুন্দরবনের দক্ষিণে নূতন দ্বীপগুলির ধারে, মৃত্তিকায় বালির পরিমাণই অত্যন্ত অধিক। এই জন্য ইহা শস্য উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি কার্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব

বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থানের জন্য ২৪ পরগণা জেলাতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। জেলার বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না সত্য বটে; কিন্তু অতি সামান্য পরিবর্তনেও জমির শস্য উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত আবহাওয়া তথ্যের অভাবে জলবায়ুর তারতম্যের সুনির্দিষ্ট হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নহে। জেলার সদর সহর আলীপুরে এবং হুগলী নদীর মুখে সাগর দ্বীপ, এই দুই স্থানে মাত্র দুইটি আবহাওয়া অফিস আছে। আলীপুর এবং সাগরদ্বীপ ছাড়া আরও আটটি জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ মাপিবার যন্ত্র রক্ষিত আছে। বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলাতেও তাপ, বৃষ্টিপাত ও বায়ুর গতি পরিবর্তন—এই কয়টির সাহায্যে বৎসরকে চারিটি প্রধান ঋতুতে বিভক্ত করা হয়। শীতকাল সাধারণত দুই মাস স্থায়ী—পৌষ ও মাঘ। ফাল্গুন মাস হইতেই গরম পড়িতে আরম্ভ করে, এবং চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ সময়ে গরম প্রচণ্ড হইলেও কালবৈশাখীর কৃপায়, বিশেষত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে, প্রবল ঝড় ও সেই সঙ্গে বারিপাত হইয়া গ্রীষ্মের প্রকোপ কমাইয়া দেয়। বর্তমান বৎসরে (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে) কাল-

বৈশাখীর দয়া কলিকাতার অধিবাসীরা ভুলিতে পারিবে না। আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল; এই ঋতুর প্রধান বিশেষত্ব প্রচুর বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি বন্ধ হইলেই অসহ্য গরম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের বৃদ্ধি এত বেশী হয় যে শরীরের ঘাম সহজে শুকায় না। সেই জন্যই আমরা ভাদ্র মাসকে 'পচা ভাদ্র' বলি। আশ্বিন ও কার্তিক, এই দুই মাসে বৃষ্টি অল্প অল্প হয়, গরমও কমিয়া যায়। ইহাই শরৎকাল। এই চারিটি ঋতুর ধারা অনুসরণ করিয়াই ২৪ পরগণা জেলার কৃষকেরা তাহাদের কৃষিকার্য সম্পন্ন করে। আমন, আউশ এবং পাট এই তিনটি শস্যই এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে আমন ধানই প্রধান। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে চৈত্র বৈশাখ মাসে কৃষকেরা এই শস্য জন্মাইবার জন্য জমিতে সার দিয়া বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রথম বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটি নরম হইলেই কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, এবং অন্তত বার তিনেক ভূমি কর্ষণ করা, মই দেওয়া, নিড়ান, চাড়া লাগান প্রভৃতি কাজগুলি এই বর্ষাকালেই হইয়া থাকে। এই ঋতুই কৃষকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ব্যস্ত থাকার সময়। শরৎকালে অবশ্য তাহারা কিছু পরিমাণ অবসর ভোগ করে। শস্য কাটা অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় এক মাস পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই সময়েও কৃষকেরা পুনরায় কর্মব্যস্ত হইয়া উঠে। ধান কাটার পরে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়, তখন তাহারা ধানঝাড়া এবং অন্যান্য গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকে।



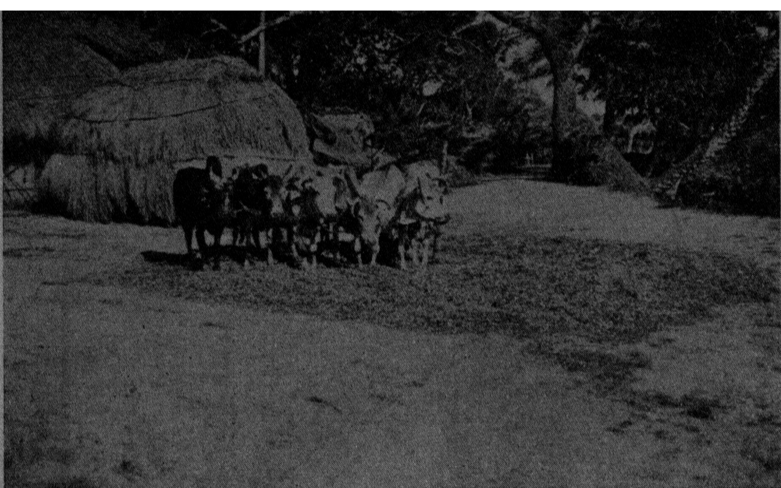
ফটোচিত্র ১১—বৈশাখ মাসে প্রথম ভূমি কর্ষণ

[দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে গঙ্গার এক প্রাচীন গর্ভে **গোবিন্দপুরের** জনৈক চাষী ছেলে গরুর সাহায্যে জমিতে লাঙ্গল দিতেছে ; এ অঞ্চলের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল, কিন্তু স্বাস্থ্য মোটেই সুবিধার নহে। (পৃষ্ঠা ২৬,১০০)]



ফটোচিত্র ১২—শাকসব্জী উৎপাদনের জন্য ভূ-উন্নয়ন

[বর্ষার জলে জমি যাহাতে ডুবিয়া না যায়, সেজন্য **বারুইপুরের** চাষীরা কঠোর পরিশ্রম করিয়া মাটি ফেলিয়া গঙ্গার প্রাচীন খাতের কিয়দংশ অন্তত ৪ ফুট উঁচু করিয়া তোলে ; ভূ-উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হইলে কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ের জন্য শাকসব্জী লাগান হয়। (পৃষ্ঠা ১০০)]



ফটোচিত্র ১৩—গবাদি পশুর সাহায্যে শস্য মাড়াই

[ধান ও অন্যান্য শস্য কাটার পর গবাদি পশুর সাহায্যে বিচালী হইতে শস্যাদি আলাদা করা হয় ; পরে শস্য গোলাজাত, এবং বিচালীকে সাজাইয়া স্তূপীকৃত করা হয়। কাকদ্বীপের পথে এই ফটো গৃহীত হইয়াছিল (পৃষ্ঠা ১১১)]



ফটোচিত্র ১৪—গ্রামাঞ্চলে ধানের গোলা

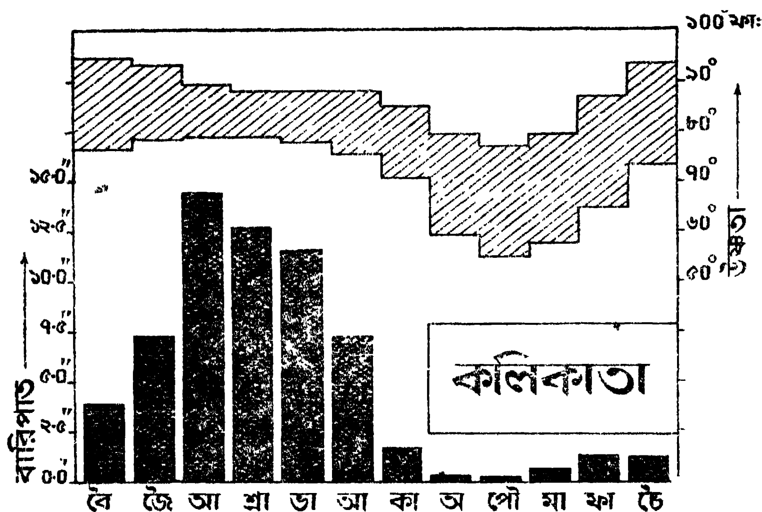
[২৪ পরগণার অবস্থাপন্ন চাষী জোতদারের গৃহপ্রাঙ্গনে এই প্রকারের ধানের গোলা এখনও দেখা যায়। মাটি হইতে কিছু উপরে গোলা বসান থাকে ; চিত্রে বড় গোলাটির মাথা টিনে ঢাকা এবং ছোটটির চাল খড়ের দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ৯৩)]

আউশ ধান সাধারণত বর্ষাকালে কাটা হইয়া থাকে। আউশের চাষীরা আমন ধান কাটিবার অব্যবহিত পরেই জমি নরম থাকিতে থাকিতে জমি চাষ করিতে আরম্ভ করে। জমিতে সার দেওয়া, দ্বিতীয়বার চাষ করা, মই দেওয়া ও সর্বশেষে, বীজ ছিটান প্রভৃতি কাজগুলি গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই হইয়া থাকে। পাট চাষ করিতে হইলেও গ্রীষ্মারম্ভের প্রথম দিকই সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত সময়, যদিও বর্ষাকালই পাট কাটার সময়। আউশ ধানের পরিবর্তে কোন কোন বৎসর মুসুরীর চাষ হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে মুসুরী বোনা হয় ও মাঘমাসে কাটা হয়। আমনের জমিতে ধান পাকিবার সময়ে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে খেসারী বোনা হয় এবং মাঘ ফাল্গুনে কাটা হয়। কাজেই, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কৃষকদের জীবনযাত্রা প্রণালী বহুলাংশে দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করিতেছে। এখন এই জেলার জলবায়ু সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

তাপ

জলবায়ুর একটি প্রধান উপাদান উত্তাপ। উদ্ভিদ জীবনে ইহার প্রভাব অনেকখানি। ২৪ পরগণা জেলায় গড়ে শীত-কালীন তাপ ৬৮·২ ডিগ্রী, কিন্তু সমুদ্রোপকূলে তাপ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অর্থাৎ ৬৯·৪ ডিগ্রী। গ্রীষ্মারম্ভে এই জেলার গড় তাপ ৮৩·৯ ডিগ্রী; উপকূল ভাগে ইহা অপেক্ষা সামান্য কম। বর্ষাকালে তাপ প্রায় একই অবস্থায় থাকে,

মাত্র উপকূলভাগে সামান্য বৃদ্ধি পায়। শরৎকালের আগমনে তাপ ৭৮·১ ডিগ্রী হইতে ৭৭·৫ ডিগ্রীতে নামিয়া যায়। বৎসরের সকল সময় তাপের আধিক্যের জন্য গাছপালা সতেজে বাড়িতে থাকে।

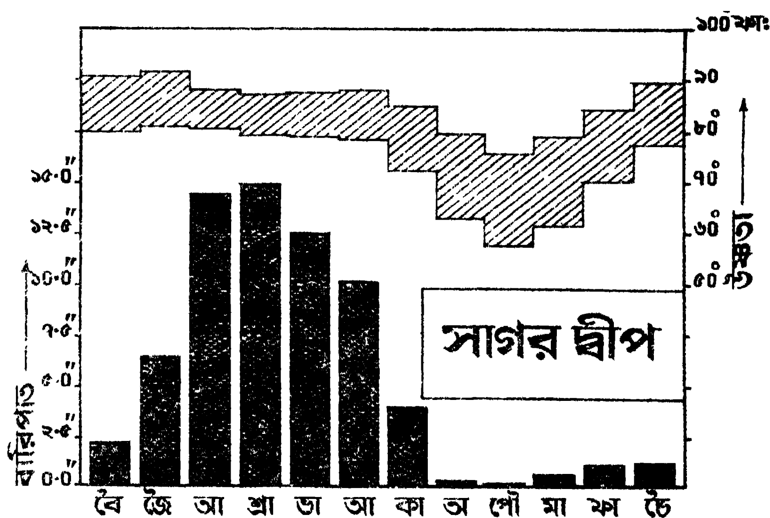


চিত্র ১— কলিকাতায় বিভিন্ন মাসে তাপ ও বৃষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি।

[চিত্রের উপরকার অংশে বিভিন্ন মাসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপ এবং নিম্নে বৃষ্টির পরিমাণ দেখান হইয়াছে। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত দিনের ও রাত্রের তাপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এই তিন মাস বৃষ্টিও খুব কম হয়।]

২নং তালিকায় এবং ১নং ও ২নং চিত্রে কলিকাতা ও সাগরে বৎসরের বিভিন্ন মাসে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রতিমাসে সর্বোচ্চ তাপ কলিকাতায় বৈশাখমাসে এবং

সাগরদ্বীপে জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠে; এবং দুইস্থানেই সর্বনিম্ন তাপ পৌষমাসে দেখা যায়। ২৪ পরগণা জেলার অন্যান্য স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক গরম পড়ে বৈশাখ মাসে। উপকূল ভাগে সামুদ্রিক প্রভাবের জন্য সর্বাপেক্ষা



চিত্র ২—সাগর দ্বীপে বিভিন্ন মাসে তাপ ও বৃষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি।

[সাগরে শ্রাবণ মাসে আষাঢ় মাসের চেয়ে বৃষ্টি কিছু বেশী হয়। প্রত্যেক মাসেই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম।]

অধিক গরম আর একমাস পরে অনুভূত হয়। ২৪ পরগণার সর্বত্র পৌষমাসে সর্বাপেক্ষা অধিক শীত বোধ হয়। সমুদ্র-তট হইতে দূরে অবস্থিত স্থানগুলিতে অন্ততপক্ষে ৪ মাস কাল সর্বোচ্চ তাপ গড়ে ৯০ ডিগ্রীরও অধিক হয় এবং সাধারণত ৭৭ ডিগ্রী হইতে ৯৬·৩ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠানামা করে।

কলিকাতায় সর্বনিম্ন বায়ুর তাপ প্রতিমাসে ৫৪ ডিগ্রী হইতে ৭৯ ডিগ্রী পর্যন্ত এবং সাগরদ্বীপে ৫৭·৭ এবং ৮১ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠানামা করে। শীতের দুইমাসে সর্বনিম্ন তাপ কলিকাতায় ৬০ ডিগ্রীর নীচে থাকে। আষাঢ় হইতে ভাদ্রমাস পর্যন্ত যখন আমন ধান মাঠে থাকে তখন সর্বনিম্ন তাপ ৭৮ ডিগ্রির নীচে যায় না।

সামুদ্রিক প্রভাবের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের মধ্যে পার্থক্য কলিকাতা অপেক্ষা সাগরদ্বীপে যথেষ্ট কম (চিত্র ১ ও ২)। কলিকাতায় দিনেরবেলা তাপ দ্রুত বাড়িয়া যায় এবং রাত্রিকালে আবার কমিয়া যায়। সাগরদ্বীপে তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে হয়।

বায়ু ও ঝড়—

উদ্ভিদের পক্ষে বায়ু অত্যন্ত উপকারী। কারণ বায়ু সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয় হইতে জলীয় বাষ্প বহন করিয়া ইহাদিগকে সজীব রাখে। শীতকালে উত্তর দিক হইতে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতেই প্রধানতঃ বায়ু আসে। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর ঐ দিকে অবস্থিত হওয়ায় এই জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে শীতকালে বায়ুর গতিবেগ অত্যন্ত অল্প থাকে এবং গ্রীষ্মারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বেগ বৃদ্ধি পায়, ও বৈশাখ মাসে প্রবল আকার ধারণ করে। বৎসরের মধ্যে ৫ মাস

কাল উপকূল ভাগে বায়ুর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক ; তখন ঘণ্টায় প্রায় ১০ হইতে ১৫ মাইল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। সমুদ্র হইতে দূরে, বৎসরে অন্তত একশত বার বাতাস হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাতাস বড় একটা বন্ধ হয় না।

বায়ুর দৈনিক গতি প্রবাহ আলোচনা করিলেও কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শীতকালে যখন বায়ু অতি ধীরে বহিতে থাকে তখন বৈকাল ৬টা হইতে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১ মাইলেরও কম থাকে। বেলা ৭টার পর হইতে বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং বেলা ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে ঘণ্টায় প্রায় ৪ মাইল বেগে বায়ু বহিতে থাকে। এক ঘণ্টা পরেই এই বেগ ৩ মাইলে নামিয়া যায় এবং বৈকাল ৪টা পর্যন্ত একই ভাবে থাকে। বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরমের সময়, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে যখন বায়ুর গতি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় তখনও বেলা ১০টা হইতে ১১টার মধ্যেই বাতাসের জোর সবচেয়ে বেশী—ঘণ্টায় ৭ মাইল। এক ঘণ্টা পরেই উহা ৬ মাইলে নামিয়া আসে এবং বৈকাল ৫ টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ঘণ্টায় ৫ মাইল হিসাবে বহিতে থাকে ; ভোর ৫ টায় ইহার গতি ক্রমশ শ্লথ হইয়া আসে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কালবৈশাখীর ফলেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত বৈকালের দিকে সহসা ভীষণ ঝড় উঠে। ইহাকে কালবৈশাখীর

ঝড় বলা হয়। কোনদিন সামান্য ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াই ইহা ক্ষান্ত হয়, আবার কোন কোন দিন প্রবল বৃষ্টি সহ প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়া ইহা মহা অনর্থের সৃষ্টি করে।

সূর্য কিরণ

সূর্য কিরণের পরিমাণ এই জেলায় কখনও এত কমে না যাহাতে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হইতে পারে। প্রতি বৎসর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সূর্যের কিরণ সব চেয়ে কম, এবং পৌষ মাঘ মাসে সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাত্র ৭ দিন দৈনিক ৬ ঘণ্টার অধিক সূর্য আকাশে দেখা যায়। পৌষ মাঘ মাসে প্রতিদিনই সূর্য-কিরণ বর্ষিত হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন কোন দিন নাই, যখন সূর্য ৬ ঘণ্টার কম আকাশে দেখা যায়।

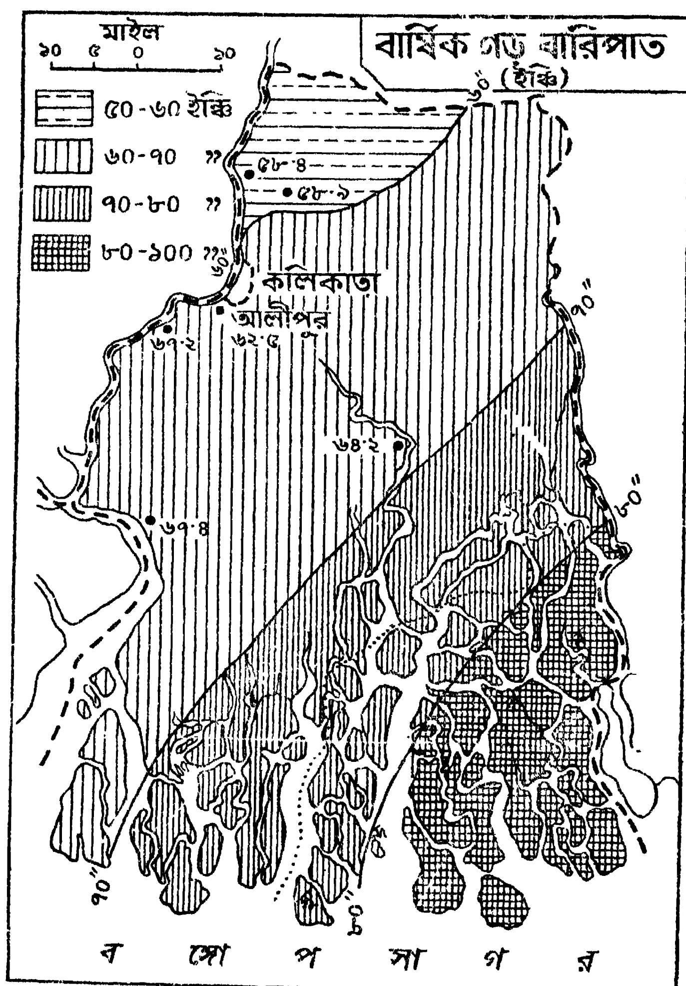
বৃষ্টিপাত

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ২৪ পরগণা জেলার কৃষি-জীবন বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগর শাখাই গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি আনয়ন করে। বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত ঝড় ও ঘূর্ণবাত দক্ষিণ পশ্চিম-মৌসুমী বায়ুর বৃষ্টি দানের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে।

যদিও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু সাধারণত আষাঢ়ের প্রথম দিনে আসিবার কথা, কিন্তু অধিকাংশ বৎসর ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। বর্তমান বৎসরে (১৯৪৯)

কলিকাতায় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রথম মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। অন্যান্য বৎসরে, যথা ১৯৪১ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে জৈষ্ঠের চতুর্থ সপ্তাহে, এবং ১৯৪২ সালে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে মৌসুমী বায়ু প্রথম আগমন করে, যদিও ঐ কয় বৎসরেই ২৪ ঘণ্টাব্যাপী প্রবল বৃষ্টিপাত আষাঢ় মাসের ১লা হইতে ৭ তারিখের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। জেলার অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন দিনে মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ সালে সাগর দ্বীপে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ প্রথম মৌসুমী বৃষ্টিপাত প্রবল বেগে আরম্ভ হয়। প্রথম দিন ২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী তিন চার দিন বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ঐ কয়দিন দৈনিক ০·৫ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় নাই। ঘূর্ণ-বাতই যে বৃষ্টির মূল কারণ তাহা পরিষ্কার বোঝা গিয়াছিল। ঘূর্ণবাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দিনগুলি খট্‌খটে শুকনো ছিল। আরও উত্তরে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ অঞ্চলে একদিন আগেই মৌসুমী বায়ুর উপস্থিতি ঘটে এবং দুই দিন ধরিয়া ৪ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু আসিবার তিন চার দিন পূর্ব হইতেই একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবশ্য ইহার অন্যথা হইতে দেখা যায়। গড় পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের সাহায্যে একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে (মানচিত্র ৫)। সাধারণত বৃষ্টি পূর্ব হইতে পশ্চিমে কমিয়া যায়।

হুগলী তটে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ উত্তর হইতে



মানচিত্র ৫—২৪ পরগণা জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টি

[বৃষ্টির পরিমাণ দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে কমিয়া যায়]

দক্ষিণে প্রায় ১০ ইঞ্চি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু

শীতকালে এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে উত্তরাঞ্চলে মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিন মৌসুমী মাসে গড়ে মাসিক বৃষ্টিপাত ১০ ইঞ্চিরও অধিক। আষাঢ় মাসে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১৫ ইঞ্চি; শ্রাবণ মাসে কিছু কম, ১২ ইঞ্চি, এবং ভাদ্র মাসে আরও একটু কম হয়। আশ্বিন মাসে এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মত, এবং কার্তিকমাসে বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বৃষ্টিপাত খুবই কম। মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত একটু একটু করিয়া বৃষ্টি বাড়িতে থাকে। বৈশাখ মাসে কাল-বৈশাখীর জন্য প্রায় ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় ও ঐ একই কারণে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাত দ্বিগুণের অধিক হইয়া যায় (কলিকাতার বৃষ্টিপাতের চিত্র ও তালিকা ৩ দ্রষ্টব্য)।

বারাসাত-বসিরহাট সমভূমি অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৯ হইতে ৬৪ ইঞ্চির মধ্যে। ইছামতীর পূর্ব-প্রান্তে, পশ্চিম প্রান্ত অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

হুগলীতট ও বারাসাত-বসিরহাট সমভূমি অপেক্ষা দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও অনেক বেশী, বিশেষত বর্ষার তিনমাস। এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৬৭ ইঞ্চি কিন্তু শীতকালে ও বর্ষার প্রারম্ভে এ অঞ্চলে বৃষ্টি খুব সামান্য হয়।

সুন্দরবনের উপকূলভাগে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এখানে আষাঢ় ও শ্রাবণ

তালিকা ২—প্রতিমাসে গড় উষ্ণতা

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কলিকাতা												
সর্বোচ্চ—	৯৪'৬°	৯৩'৬°	৮৯'৬°	৮৮'০°	৮৮'১°	৮৮'১°	৮৪'৮°	৭৯'৫°	৭৬'৬°	৭৯'৩°	৮৬'৮°	৯৩'৭°
সর্বনিম্ন—	৭৬'৭°	৭৮'৫°	৭৯'১°	৭৯'০°	৭৮'০°	৭৫'৭°	৭০'২°	৫৯'৮°	৫৪'৫°	৫৭'৫°	৬৪'৮°	৭৩'২°
সাগরদ্বীপ												
সর্বোচ্চ—	৯০'৮°	৯১'৫°	৮৮'৩°	৮৭'৩°	৮৭'৮°	৮৮'০°	৮৪'৮°	৭৯'৫°	৭৫'৮°	৭৮'৮°	৮৪'০°	৮৮'৮°
সর্বনিম্ন—	৮০'০°	৮১'০°	[illegible]	৭৯'৮°	৭৯'৭°	৭৮'৭°	৭২'২°	৬২'৩°	৫৭'৭°	[illegible]	৭০'০°	৭৭'৩°

তালিকা ৩—প্রতি মাসে বৃষ্টিপাত

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কলিকাতা	৩'৮"	৭'২"	১৪'৫"	১২'৭"	১১'৫"	৭'২"	১'৭"	'২২"	'৩১"	'৬৬"	১'৩"	১'৩"
সাগরদ্বীপ	২'৪"	৬'৯"	১৪'৬"	১৫'১"	১২'৫"	১০'১"	৪'১"	'৩৭"	'১৭"	'৬৬"	১'১"	১'১"

মাসে গড়ে প্রায় ১৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, শ্রাবণ মাসে আষাঢ় মাস অপেক্ষা কিছু বেশী। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বৃষ্টির পরিমাণ কিছু কমিয়া গেলেও ১০ ইঞ্চির নীচে নামে না। কার্তিক মাসে কলিকাতার অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃষ্টি হয়। আবার কলিকাতার মতই পৌষ মাসে বৃষ্টি সব চেয়ে কম এবং মাঘ মাস হইতে বৈশাখ পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। কাল-বৈশাখীর প্রকোপ এ অঞ্চলে কিছু কম, কাজেই সেই অনুপাতে বৃষ্টিও কম হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির দৈনিক পরিমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দিনের পর দিন একভাবে বৃষ্টি হয় না। আজ হয়ত খুব বৃষ্টি; আবার কাল একেবারেই বৃষ্টি নাই; ইহাই এখানকার জলবায়ুর বিশেষত্ব। ১৯৩৯ সালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। আষাঢ় মাসের শেষ ছয় দিন ও শ্রাবণ মাসের প্রথম চার দিন বৃষ্টির বিরাম ছিলনা এবং সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হইয়াছিল শেষের দিনে (৪ ইঞ্চি)। পরবর্তী দশ দিনে সামান্যই বৃষ্টি হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, যদি কোন বৎসর অপেক্ষাকৃত দেরীতে বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বর্ষার শেষের দিকে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক হয়। একদিন অতিবৃষ্টি ও পরের দিন অনাবৃষ্টি হইতে থাকিলে অবশ্য ভূমি কর্ষণ এবং ধান্যের চারা রোপণ ইত্যাদি কাজ গুলি সহজ হইয়া যায়। কিন্তু জমিতে জল দাঁড়াইয়া যাওয়ার ফলে অতিরিক্ত বর্ষার জল নিকাশ করা সম্ভবপর হয় না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য জমির উপরি-ভাগের ভাল মাটিরও ক্ষয় হয়।

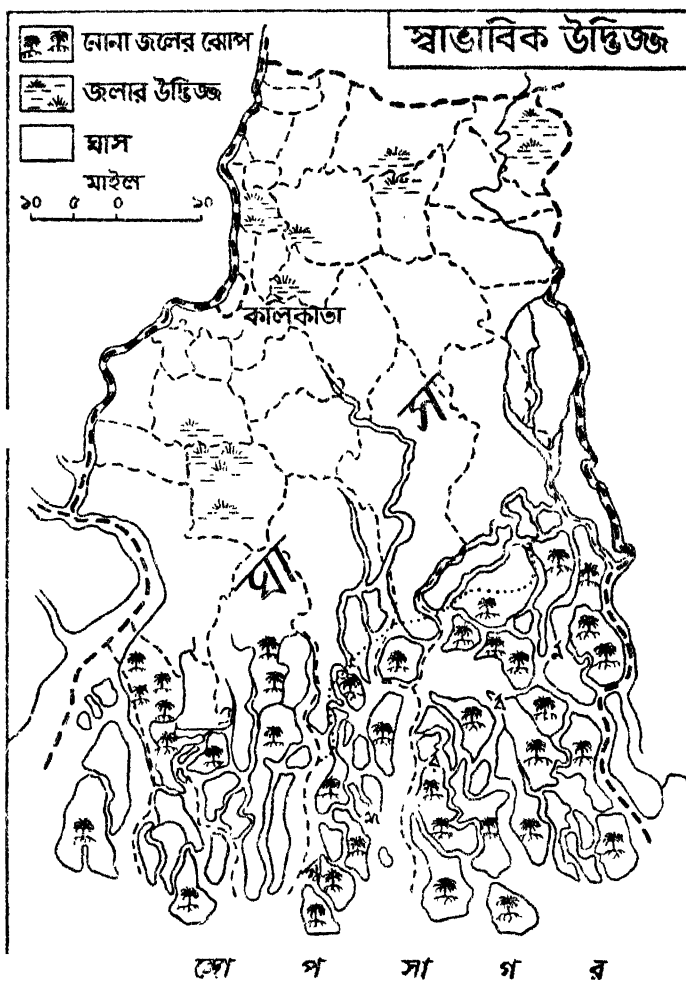
আর্দ্রতা

আবহাওয়ার আর্দ্রতা জলবায়ুর আর একটি প্রধান উপাদান। ইহার সহিত উদ্ভিদ্ জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কোন স্থানের জলবায়ু শুষ্ক বা আর্দ্র, ইহা আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপরেই স্থিরীকৃত হয়।

২৪ পরগণা জেলার চৈত্র বা বৈশাখ মাস সর্বাপেক্ষা শুষ্ক। বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতার পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়া যায়, এবং অস্বচ্ছন্দতা সৃষ্টি করে। বৃষ্টির কয় মাসই বিশেষত ভাদ্র মাসে আমরা বড়ই অস্বস্তি অনুভব করি। আশ্বিন মাসে বৃষ্টিপাত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও পুনরায় কমিয়া আসে এবং ফলে দেশের জলবায়ু আবার মনোরম হইয়া উঠে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ

২৪ পরগণা জেলার প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এক সময় মনুষ্য বাসের অযোগ্য, শ্বাপদ সঙ্কুল ঘন বনানী বিরাজ করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনে তাহার কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে এবং বিশালকায় নদীর দুই পার্শ্বে ম্যানগ্রোভের ছোট ছোট ঝাড় আপনা আপনি গজাইয়া উঠে; ইহার শিকড়গুলি ভাটার সময় মাটির উপরে থাকে। আরও কিছু উত্তরে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল রহিয়াছে। এই জঙ্গলে সুন্দরী, গরাণ, হিন্তাল প্রভৃতি গাছ জন্মে। জেলার উত্তর অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বলিতে এখন ঘাসই বোঝায়। জলাভূমিতে ভাসমান বহুপ্রকার উদ্ভিজ্জ দেখা যায় (মানচিত্র ৬)।



মানচিত্র ৬—২৪ পরগণা জেলার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ; অর্থাৎ যে সকল গাছপালা আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের অবস্থান দেখান হইয়াছে।

[এই জেলার অধিকাংশ স্থানে ঘাসই প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ; ঘাস তুলিয়া ফেলিয়া নানা প্রকার বীজ বপন করা হয়।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

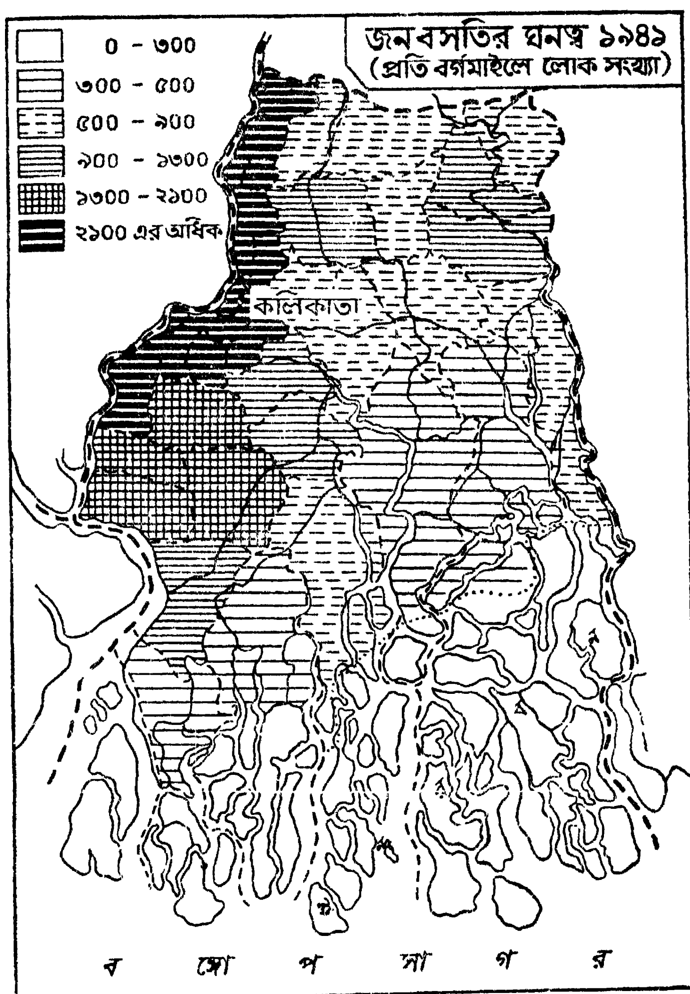
মানুষের বসবাস

অবিভক্ত বাংলা দেশের জেলা গুলির মধ্যে ২৪ পরগণা জনসংখ্যায় চতুর্থ স্থান এবং আয়তনে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া ছিল; ১৯৪১ সালের আদমসুমারীর গণনা অনুযায়ী এই জেলার লোক সংখ্যা ৩৫,৩৬,৩৮৬। ইহার সহিত কলিকাতার ২১,০৮,৮৯১ লোক সংখ্যা যোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, কলিকাতার সন্নিহিত এই জেলাটির জমির উপর কি পরিমাণ লোকেরা তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ইত্যাদির জন্য নির্ভর করিতেছে। কলিকাতা সহ এই জেলার আয়তন যদি ৩৭৩০ বর্গমাইল ধরা হয়, তাহা হইলে এই ভূভাগে প্রতি বর্গমাইলে কিঞ্চিদধিক ১৫০০ লোকের বসতি দেখা যাইবে। গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গভঙ্গের পর হইতে কলিকাতা ও জেলার প্রায় সর্বত্র লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক সংখ্যার অনুপাতে কৃষি-জমির পরিমাণও দ্রুত কমিয়া গিয়াছে। এই প্রকার কৃষি প্রধান অঞ্চলে, যেখানে শতকরা ৬০ জন লোক কৃষিজীবি, এত ঘন বসতি নিঃসন্দেহে দেশের পক্ষে শুভ নহে। এই কারণেই সাধারণের জীবনযাত্রার মান এত কম। প্রত্যেক আদম সুমারীতেই দেখা গিয়াছে যে সমগ্র বাংলা দেশের তুলনায় এই জেলায় জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, সমগ্র বাংলা দেশের

অন্যান্য জেলা অপেক্ষা ২৪ পরগণার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী কৃষি ও শিল্পের পক্ষে অধিকতর অনুকূল।

১৯২১ সালের পর হইতে কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমগ্র জেলা অপেক্ষা অধিক ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম আদমসুমারীর বৎসরেও (১৯০১ খৃঃ) এই শহরে অনুরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়।

৭নং মানচিত্রে জেলার জনসংখ্যা কোথায় কত তাহা দেখান হইয়াছে। জেলার তিনটি স্থানে লোকের বসতি অত্যন্ত ঘন। ইহাদের মধ্যে হুগলী নদীর তীরবর্তী স্থানে, হালিসহর হইতে আরম্ভ করিয়া বজবজ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক ঘন বসতি। কলিকাতার জন সংখ্যা না ধরিয়াও এই অঞ্চলের লোক সংখ্যা সমগ্র জেলার জন সমষ্ঠির এক তৃতীয়াংশ। যদি ইহার সহিত কলিকাতার জনসংখ্যা ধরা হয় তবে দেখা যাইবে যে, কলিকাতা সহ ২৪ পরগণা জেলার সমগ্র লোক-সংখ্যার ৫৫ ভাগেরও অধিক এই অঞ্চলেই বাস করে। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য হুগলীতটে জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। জন বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে কিঞ্চিৎদধিক চার হাজার। কলিকাতার দক্ষিণে ঘন বসতিপূর্ণ আর একটি অঞ্চল দেখা যায়। ইহা আয়তনে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল এবং আকারে প্রায় গোল। এই স্থানের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ এবং প্রতি বর্গমাইলে ইহার ঘনতা ১৫০০। হুগলী এবং ইছামতীর মধ্যবর্তী বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে পশ্চিম হইতে



মানচিত্র ৭—২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকের বসবাস। গঙ্গার তীরে সব চেয়ে বেশী লোকের বাস দেখা যাইতেছে।

পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আর একটি ঘন বসতি দেখা যায়। এই অঞ্চলের ঘনতা এক হাজারের কিছু বেশী। এখানকার জনসংখ্যা সমগ্র জেলায় জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। জনবিরল স্থান সমূহের মধ্যে আমডাঙ্গা-স্বরূপনগরের নাম করা যাইতে পারে। এখানে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ৭০০ লোকের বাস। ২৪ পরগণা জেলার সুন্দর বনের যে অঞ্চলগুলিতে সম্প্রতি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করা হইতেছে, তাহার আয়তন এত বেশী যে, যদিও প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা জেলার মধ্যে সব চেয়ে কম, তাহা সত্ত্বেও জেলার লোক সংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ এখানেই বাস করে। ইহার উত্তরে সুন্দর বনের যে সমস্ত অঞ্চল বহু পূর্বে কৃষি জমিতে পরিণত করা হইয়াছিল তাহাদের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে কিছু বেশী। এই জেলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বর্তমান সুন্দরবনের জঙ্গল প্রায় ১০০০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সমগ্র বনভূমি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংরক্ষিত বলিয়া কাহাকেও এখানে বাস করিতে দেওয়া হয় না। মানুষের বসতির ধারার সহিত ভূমির ব্যবহারের এক নিকট সম্বন্ধ আছে। হুগলীতট অঞ্চলে নদীর ধারেধারে লোকের বাস; এখানে কৃষকেরা প্রধানত ফল ও শাকসব্জী উৎপাদন করে। কলিকাতার দক্ষিণে বারুইপুর-জয়নগর অঞ্চলেও গ্রামগুলি এক নির্দিষ্ট দিকে প্রসারিত, কারণ এক সময় গঙ্গা এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত ও গঙ্গার দুই তটে নূতন নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই স্থান হইতে প্রচুর শাকসব্জী ও ফলমূল ইত্যাদি কলিকাতায় আমদানী

হইয়া থাকে। ২৪ পরগণা জেলার কৃষি প্রধান অঞ্চলে লোকেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় গ্রামে বাস করে, যদিও স্থানে স্থানে নদীতটবর্তী অঞ্চলের মত নির্দিষ্ট দিকে বসতি দেখা যায়। সুন্দরবনের যে অঞ্চলে বসবাস সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে কুটীরগুলি এখনও চারিদিকে ছড়াইয়া আছে; গ্রাম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এ অঞ্চলে এখনো গড়িয়া উঠে নাই।

জেলার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলি দেখিলে মনে হয় তাহারা ও যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তালিকা ৪

২৪ পরগণা ও কলিকাতার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার

	সমগ্র জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার				
	১৯৪১	১৯৩১-৪১	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৮৯১-১৯০১
অবিভক্ত বাংলা	৬,১৪,৬০,৩৭৭	২০'৩	৭'৩	২'৭	৭'৯	৭'৭
২৪ পরগণা	৩,৫৩৬,৩৮৬,	২৮'৭	১০'৩	৭'৪	১৫'৫	৯'৬
কলিকাতা	২১,০৮,৮৯১,	৮১'২	১১'২	৩'২	৯'৯	২৩'৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

২৪ পরগণার যন্ত্রশিল্প

বাংলা দেশে ২৪ পরগণা জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্র-শিল্পের সমাবেশ দেখা যায়। নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই এই ধরণের শিল্পের সমাবেশ হইয়াছে। যন্ত্রশিল্পের মধ্যে পাট শিল্পই সর্বপ্রধান। বাংলা দেশের চট কলের শতকরা ৬০ ভাগ এই জেলাতেই অবস্থিত। বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের মধ্যে অর্দ্ধেক কেবলমাত্র এই শিল্পেই কাজ করে। প্রতি কারখানায় গড়ে প্রতিদিন কিঞ্চিদধিক ৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। চটকলের পরেই কাপড়ের কলের নাম করা যাইতে পারে। এই শিল্পে চটকল শ্রমিক সংখ্যার শতকরা দশভাগ লোক কাজ করে। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প তেমন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। আভ্যন্তরিক বাজারের চাহিদা, কল চালাইবার জন্য সস্তায় কয়লা এবং বয়নশিল্পে অভিজ্ঞ নিপুণ তাঁতি সম্প্রদায় থাকার জন্য ভারতের মধ্যে বাংলা দেশেরই বস্ত্রশিল্পে প্রধান স্থান অধিকার করা উচিত ছিল। বস্ত্রশিল্পের প্রতি আমাদের শিল্পপতিদের অবহেলাই বাঙ্গালীকে বস্ত্রের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে। আমরা রেশম শিল্পেরও অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। বাংলাদেশে ২টি মাত্র রেশমের কারখানায় মাত্র ১০০০ শ্রমিক নিযুক্ত

তালিকা ৫
২৪ পরগণার যন্ত্রশিল্পের অবস্থা*

শিল্পের নাম	কলকারখানার সংখ্যা		শ্রমিকের সংখ্যা	
	অবিভক্ত বাংলা	২৪ পরগণা	অবিভক্ত বাংলা	২৪ পরগণা
১। তন্তুশিল্প				
চটকল	৯৫	৪৭	২,৭৯,৯১৯	১,৫৯,৬৬৩
পাট কল	২৩	১৫	৮,৮৭৩	৬,৮৫২
কাপড়ের কল	১৬	১১	২০,৪১০	১৫,৮৬৭
গেঞ্জির কল	২৮	১০	১,৬০৭	৬৩৭
রেশম কল	৬	৫	৮২১	৭৭১
২। খাদ্যশিল্প				
চাউলের কল	৩৬২	৮৭	১৩,৯৭২	৩,৭২০
ময়দার কল	৯	৪	১,২৬৩	২৬৬
তেলের কল	৩০	২	২,২০৮	২২৭
পাঁউরুটি তৈয়ারীর কারখানা	৭	৩	১,২০১	৯০১
৩। অন্যান্য শিল্প				
গালার কারখানা	২	২	৭৪৩	৭৪৩
কাগজের কল	৪	৩	৮,১৭৬	৬,২৪২
চর্ম ও পাদুকা শিল্প	৫	৩	৮,৪৭০	৮,৩৩১
ট্যানারী	৬	৬	৬৩৮	৬৩৮
দিয়াশলাই কারখানা	৬	৬	২,৫৩৯	২,৫৩৯
রবারের কারখানা	১৬	১২	৭,০৭৯	২,১৬৬
সাবানের কারখানা	৯	৭	৬৭৫	৫৫৩
কাচ শিল্প	২০	১৩	৪,৯৯০	৩,৫৪২
তামাকের কারখানা	৩	৩	৪,০৯৪	৪,০৯৪

* ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের কলকারখানার তালিকা হইতে সংকলিত।

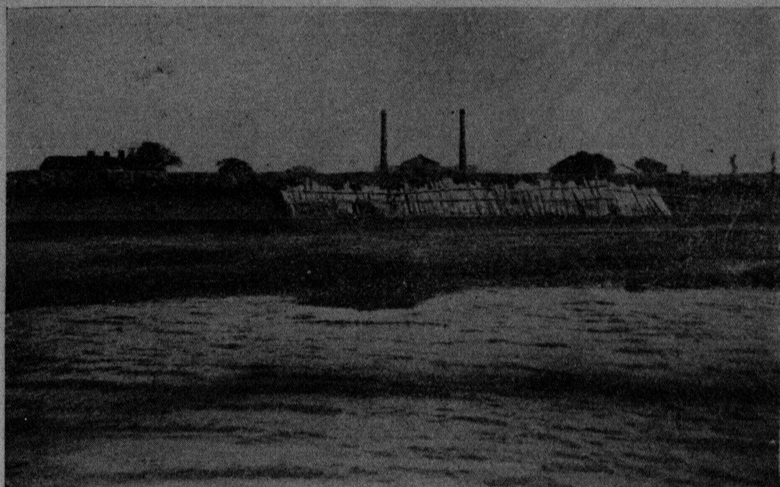
তালিকা ৫ (অবশিষ্টাংশ)

শিল্পের নাম	কলকারখানার সংখ্যা		শ্রমিকের সংখ্যা	
	অবিভক্ত বাংলা	২৪ পরগণা	অবিভক্ত বাংলা	২৪ পরগণা
অন্যান্য শিল্প—				
সার নির্মাণের কারখানা	৯	৬	১,৩৪১	৯২৬
রংএর কারখানা	১১	৮	২,৫১৩	১,৪৭২
চীনা মাটির কারখানা	১২	৬	৪,৪৯৮	২,৫২১
কলের গানের রেকর্ডের কারখানা	১	১	১,০৬৪	১,০৬৪
বাঁধাই ও ছাপার কারখানা	৮৭	১১	৮,৬৫৭	১,৮৭৫
৪। ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা—				
রেলওয়ে ওয়ার্কসপ্	২৬	৫	৩৩,৮১৯	১০,৩৮৪
অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী	৪	৪	৩৩,৭৪০	৩৩,৭৪০
টেলিগ্রাফ ওয়ার্কসপ্	১	১	৩,৪০০	৩,৪০০
ডক	৪	৩	২,৩০১	১,৯৩২
জাহাজ মেরামতের কারখানা	১০	৪	২১,৯০৯	১১,২৮৪
সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং	২৬১	৯৭	৬০,৬২৬	২৭,৪৬০
ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং	২৬	১৩	৫,৪৫৬	৪,৪৮৪
ষ্টীল রোলিং মিল	১৫	৪	২২,২৭৫	২৪২
লেড রোলিং মিল	২	২	৯৪৭	৯৪৭
ট্রামওয়ে ওয়ার্কসপ্	১	১	১,১৩৩	১,১৩৩
মোটর মেরামতের কারখানা	১৯	৮	৩,৫২৭	২,৪৪৬
মেটাল ষ্ট্যাম্পিং	১০	৪	৩,৩৩১	২,৫১৫
কেরোসিন টিন ও প্যাকিং	১৪	১০	৩,৮১০	২,৬৬৩
কার্পেণ্টারী ও ক্যাবিনেট তৈরীর কারখানা	১২	৭	১,৪০৬	১,০৯৫
৫। সাধারণের জন্য সরবরাহকারী শিল্প—				
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র	১০	৪	৩,০১৬	১,৮৭৯
গ্যাস্ ওয়ার্কস্	৫	৩	১,২৪৭	১,১৭৫
জলপাম্পিং ষ্টেশন	৭	৫	১,৪৩০	১,৩১০

আছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাগজের কল এখানে স্থাপিত হয়। এই শিল্পের উন্নতিও অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। জেলার মধ্যে দুইটি কাগজের কলে ৫০০০ শ্রমিক কাজ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কেমিক্যাল, দিয়াশলাই, ও কাচ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন চলিতে থাকে তখন ইহারা দ্রুত প্রসারলাভ করে। লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা এই জেলাতে নাই; যদিও কতকগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় প্রচুর লৌহ এবং ইস্পাত ব্যবহার করিয়া কলকব্জা তৈয়ারী করা হয়।

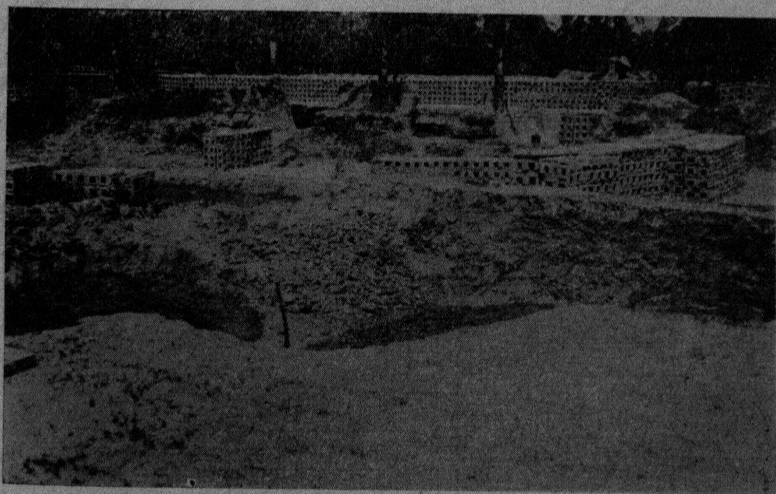
বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারী কলগুলির মধ্যে চালের কলগুলি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশই কলিকাতার সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। গ্রামে চালের কল খুবই কম। ভবিষ্যতে যাহাতে দেশের সর্বত্র চালের কল গড়িয়া উঠে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। জেলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত, কাজেই ময়দার কলের সংখ্যাও কম। সরিষার তৈল বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য, ফলে ২৪ পরগণায় এই জাতীয় বহু তেলের কল আছে। এই জেলায় তামাক শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। তামাকের কারখানায় দৈনিক ১০০০ শ্রমিক নিযুক্ত থাকে।

ভারতবর্ষের গ্যাস কোম্পানীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ওরিয়েণ্টাল গ্যাস ওয়ার্কস্ সহ তিনটি গ্যাস সরবরাহের কারখানা, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের চারিটি বিদ্যুৎ



ফটোচিত্র ১৯—মাতলার তীরে চালের কল

[মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত চালের কলের দুইটি চিমনি, এবং নদীগর্ভের এক পাশে মাছ ধরার জন্য মাটির বাঁধ দিয়া ঘেরা একটি ভেরী চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১০৭)]



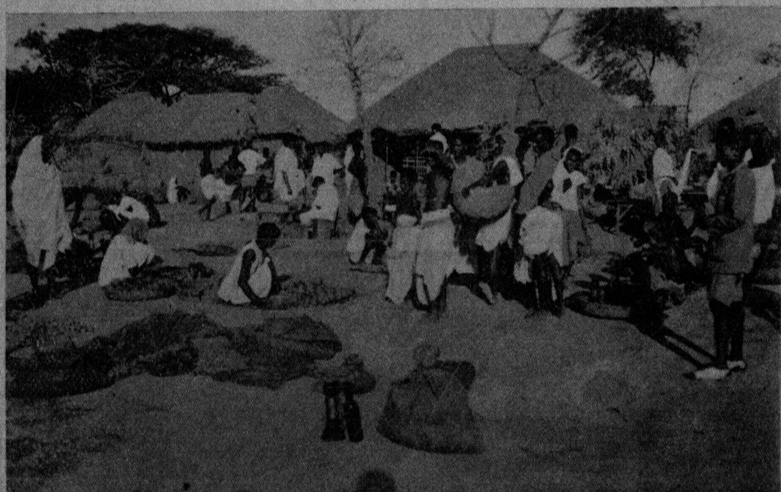
ফটোচিত্র ২০—গঙ্গার তীরে ইটখোলা

[কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্য ইটের চাহিদা খুব বেশী বলিয়া গঙ্গার বর্তমান ও প্রাচীন তীরে, বিশেষত ব্যারাকপুরে এবং বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহু ইটখোলা দেখা যায়। (পৃষ্ঠা ১০০)]



ফটোচিত্র ২১—মগরাহাট—চাউল ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র

[গত মহাযুদ্ধের পূর্বে মগরাহাট রেল ষ্টেশন হইতে বহু টাকার চাল কলিকাতা ও শহরতলীতে রপ্তানী হইত। ষ্টেশনের ধারে মাল গাড়ীতে বোঝাই করিবার জন্য বহু চালের বস্তা চিত্রে দেখা যাইতেছে। আশপাশের অঞ্চল হইতে নৌকা করিয়া চাল ষ্টেশনে আনিবার জন্য একটি খাল কাটা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ১০২)]



ফটোচিত্র ২২—আবাদী সুন্দরবনের একটি হাট

[২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করিয়া আবাদী সুন্দরবনে, সপ্তাহে দুই একবার করিয়া ছোট ছোট হাট বসিয়া থাকে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় এই হাটে হইয়া থাকে। (পৃষ্ঠা ১১১)]

উৎপাদনাগার এবং ফলতার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জল পাম্পিং ষ্টেসন সহ পাঁচটি জল সরবরাহের প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও নিকটবর্তী শহরগুলিতে প্রয়োজনীয় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জল যোগাইয়া থাকে।

এখানকার যন্ত্রশিল্প প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ শ্রমিকের সংখ্যাও খুব বেশী নহে, সমগ্র শ্রমজীবির শতকরা মাত্র ২০ জন। কাজেই জেলার অধিকাংশ লোককে কৃষি-জমির উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। আবার কারখানাগুলি জেলার মাত্র এক অংশে অবস্থিত বলিয়া ২৪ পরগণার বৃহত্তর অংশে কৃষিকার্যের উপর সকলকে আরও অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য

ব্যবসায়ীর সংখ্যা এখানে অত্যন্ত কম; সমগ্র কর্মীদের শতকরা মাত্র ৬ ভাগ ব্যবসায়ে লিপ্ত। অধিকাংশ শিল্প প্রধান শহরগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা সর্বশ্রেষ্ঠ। ১নং মানচিত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির অবস্থান দেখান হইয়াছে। সাধারণত বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে যেখানে বহু রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, যেমন বারাসাত; অথবা যেখানে একটি বড় রাস্তা আসিয়া শেষ হইয়াছে, যেমন টাকী; অথবা যেখানে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন—রেল, ষ্টীমার ও মোটর একত্র মিলিত হইয়াছে, যেমন বসিরহাট। নাব্য খালগুলিও ভাঙ্গর প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র গঠনে সাহায্য করিয়াছে।

দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি নদীতীরে অথবা বৃহৎ কোন রাস্তার ধারে অবস্থিত। এতদঞ্চলে হাট নামে পরিচিত ছোট ছোট বাজারগুলি নদীর তীর, বড় রাস্তা বা রেলপথের ধারে ধারে দেশের সর্বত্রই অবস্থিত। এই হাট গুলি সাধারণত সপ্তাহে নির্দিষ্ট দুই দিন বসে।

যানবাহন

এই জেলার যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা আশানুরূপ নহে। ১নং মানচিত্রে কলিকাতা হইতে রেলপথ গুলি কি ভাবে বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত তাহা দেখান হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরে হুগলীতটের মধ্য দিয়া প্রথম রেলপথ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। এই রেলপথ দ্বারা জেলার বহু উল্লেখযোগ্য শিল্প-কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে শহরতলী অঞ্চলের লোকেরাই ইহার সুবিধা ভোগ করে।

এই প্রধান রেলপথ হইতে কয়েকটি শাখা লাইন বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইলে গ্রামাঞ্চলের সহিত শহরের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠভাবে রাখা সম্ভবপর হইত। কলিকাতা হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে আরও একটি প্রধান লাইন অগ্রসর হইয়া কতকগুলি ছোট ছোট শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গেজের ২½ ফুট রেলপথ বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলের ভিতর দিয়া কলিকাতাকে পূর্বদিকে অবস্থিত প্রধান কৃষি-অঞ্চলের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। কলিকাতার উত্তরে সমগ্র রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৩০ মাইল, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে আধ মাইল হিসাবে রেলপথের বিস্তৃতি।

কলিকাতার দক্ষিণে মাত্র একটি ছাড়া সমস্ত রেলপথ গুলিই পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, এবং দক্ষিণে কৃষি-অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গ মাইল স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রাখিয়াছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় রেলপথ কলিকাতা ও মাতলার (পোর্টক্যানিং) মধ্যে খোলা হয়। কিছুদিন পরে আর একটি লাইন কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে স্থাপিত হয়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে হুগলী নদীগর্ভ বালি প্রভৃতির দ্বারা দ্রুত ভরাট হইতে থাকায় কলিকাতা বন্দর অব্যবহার্য হইয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। এই কারণেই কলিকাতা বন্দরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত রেলপথগুলি খোলা হয়। দক্ষিণাঞ্চলে কালিঘাট-ফলতার ছোট লাইন সহ রেলপথের দৈর্ঘ্য উত্তর অঞ্চলের রেল লাইনের দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেল লাইন গিয়াছে, সেই অঞ্চলের মধ্যেই পাকা রাস্তাগুলিও সীমাবদ্ধ। এই জেলায় প্রায় ৪০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ৩০০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। কাঁচা রাস্তা শীতকালে ধূলি ধূসরিত থাকে ও বর্ষাকালে কাদায় ভরিয়া যায়। পাকা রাস্তাগুলির মধ্যে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও ডায়মণ্ডহারবার রোড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত রাস্তাটি কলিকাতার উত্তরস্থ শহরতলী হইতে মিল অঞ্চলের মধ্য দিয়া বারাকপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দুই পার্শ্বে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম দিকে, বড় বড় কলকারখানা থাকায় ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বারাকপুর ষ্টেসনের নিকট হইতে আর একটি

রাস্তা নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া সহরের মধ্য দিয়া নদীয়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। যেগুলি রেলপথের নিকটবর্ত্তী নহে তাহাদের মধ্যে উত্তরে দুইটি রাস্তায়—কৃষ্ণনগর ও মসলন্দপুর রোডে, এবং দক্ষিণে বারুইপুর-মাতলা রোডে দিনরাত মাল ও লোক চলাচল করিয়া থাকে।

রেলপথ এবং ভাল পাকা রাস্তার অভাবে জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কৃষিজাত এবং বনজ দ্রব্যগুলি কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্প-প্রধান নগরে দ্রুত পাঠান সম্ভবপর হয় না। তিনটি প্রধান জলপথ কলিকাতা নগরীকে জেলার এই অঞ্চলের সহিত যুক্ত রখিয়াছে। ইহারা—(১) উত্তর দিকের জলপথ, (২) ভিতর সুন্দরবন জলপথ ও (৩) বাহির সুন্দরবন জলপথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ দিকের জলপথটি কলিকাতাকে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া আসামের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। বড় বড় ষ্টীমারই একমাত্র এই পথে চলিতে পারে।

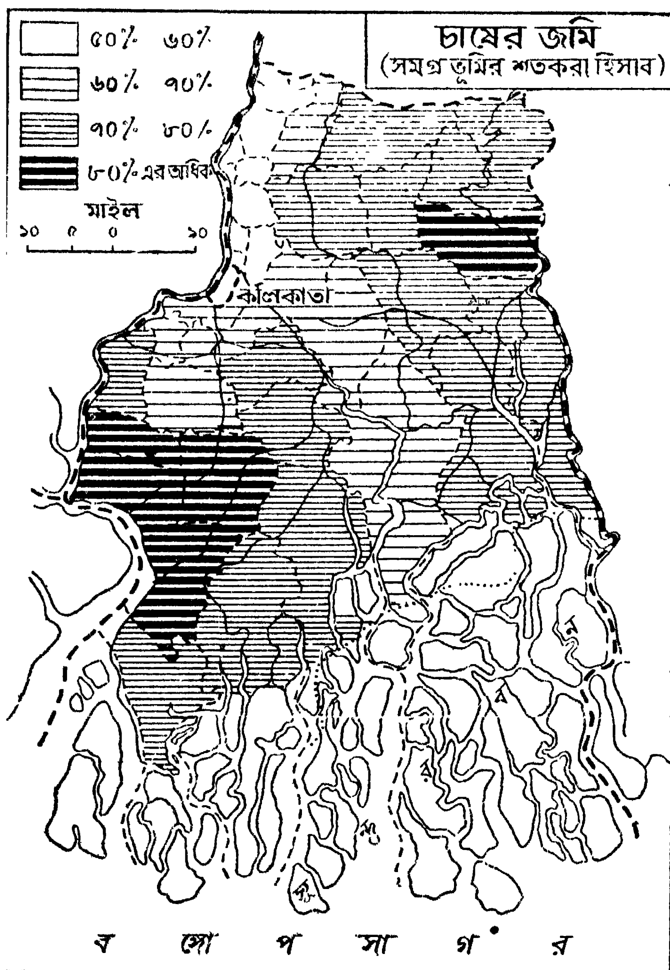
মোটামুটি এখন বলা যাইতে পারে যে, শহরতলী ও প্রধান প্রধান কৃষি অঞ্চল ছাড়া দ্রুত যানবাহনাদি চলাচলের বিশেষ কোন ব্যবস্থা ২৪ পরগণা জেলায় নাই। কাজেই, জমির সম্যক ব্যবহারের ইহা একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, কলিকাতার সংলগ্ন হওয়ায় ইহার কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশী। তবে যে সমস্ত কৃষিজ দ্রব্য সহজেই নষ্ট হইয়া যায়, যেমন শাকসব্জি, ফল, ফুল ইত্যাদি, তাহাদিগকে গ্রামাঞ্চল হইতে শহরে দ্রুত স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকদের জীবন যাত্রার মান সম্যক বৃদ্ধি পায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষিকার্যের ধারা

২৪ পরগণা জেলায় ১৯২৯ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কি ভাবে জমি ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা ৬নং তালিকায় দেখান হইয়াছে। সুন্দরবনের বহু স্থানে চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখনও জেলার দক্ষিণাংশ কৃষকের হস্তস্পর্শ করে নাই (মানচিত্র ৮)। এই জেলায় আবাদী জমির আয়তন কিঞ্চিদধিক ১৪½ লক্ষ একর এবং প্রাচীন ও বর্তমান সুন্দরবনের আয়তন ১৮ লক্ষ একরের কিছু বেশী। এই ১৮ লক্ষ একরের মধ্যে মাত্র চার লক্ষ একর জমিতে চাষবাস আরম্ভ হইয়াছে এবং আরও চার লক্ষ একর জমিকে ঐ উদ্দেশ্যে লিজ্ দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরবনের বাহিরে যে জমি আছে তাহারও শতকরা ৩০ ভাগ চাষের অযোগ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। কাজেই, চাষের জমির অভাবে এই জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় না, এবং সাধারণ লোকেরা কোনসময়েই দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। এই জেলার শ্রমশিল্প গুলিও এতটা উন্নত নয় যে, কৃষিভূমির অভাব মিটাইতে পারে। ইহা সত্য যে, আবাদী জমির আয়তন ১৯২৯-৩০ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালের মধ্যে, অর্থাৎ ১৫ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে কোন কোন

বৎসরে, যেমন ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬, ১৯৩৯-৪০, ১৯৪০-৪১ সালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কৃষিমজুরের অভাব প্রভৃতি কারণে



মানচিত্র ৮ ঃ চাষের জমি। [বর্তমান সুন্দরবনে কোনপ্রকার চাষবাস আরম্ভ হয় নাই]

বহু জমিতে আবাদ করা সম্ভবপর হয় নাই, ফলে আবাদী জমির আয়তন হ্রাস পায়।

তালিকা ৬

২৪ পরগণায় বিভিন্ন প্রকার জমি

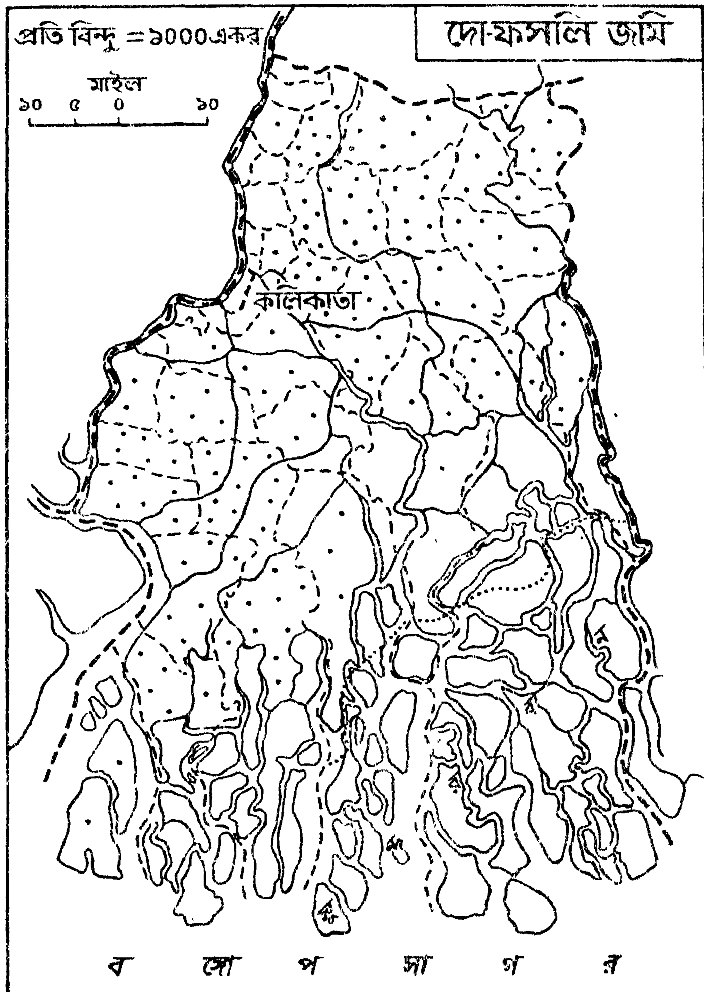
[জমির পরিমাণ একর হিসাবে]

সাল	আয়তন সমগ্র	বনভূমি	আবাদী জমি	দো-ফসলি জমি	পতিত জমি	কর্ষণযোগ্য অকর্ষিত ভূমি	কৃষিকার্যের অনুপযোগী ভূমি
১৯২৯-৩০		১,০৮৯,৫১৬	৭৩০,৮০০	৯১,৩০০	৩৮৬,১৪৮		
১৯৩০-৩১			৭৩৮,৫০০	১২৫,৩০০	৩৪৯,৭:৬	৩২৮,০৩১	
১৯৩১-৩২		১,১১৮,২৩৮	৭৭৯ ৩০০	১৩৩ ২৭০	৩০৭,৮২৬		
১৯৩২-৩৩			৭৮০,৪০০	১৩১,৪০০	৩০৭,৮১৬	৩ ৭.৮২৬	৫৭৭,৬৫৫
১৯৩৩-৩৪		১,০৪৭,২২১	৭·৭,৯০০	১৩৭,৪০০	৩৩১,'৪৩	৩' ৮,৭৩১	
১৯৩৪-৩৫	৩,১০৭,৮৪০		৭৭৩,৯০০	১৩৬,৪০০	৩৫৫,৫৪৩		
১৯৩৫-৩৬			৭৬৪,৩০০	১১৫,২০০	৩৬৯,০৩০	৩৫৮,৫৩১	৫০২,৮৯০
১৯৩৬-৩৭		১,০৪৩,০৮৯	৭৮০,৪০০	১১৪,৫০০	৫৫৩,০১০	৫৫৮,৬৬১	
১৯৩৭-৩৮			৮২১,৩০০	১১১,০০০	৩১২,১১০		
১৯৩৮-৩৯			৯২৫,০০০	১১৯,১০০	২০৮,৪০০		
১৯৩৯-৪০		১,০৪৩,০৯০	৯১০,৫০০	১১২,৬০০	২২৩,১৭৫	৬৩১,৮৪০	৫৭২,৬৮০
১৯৪০-৪১			৯১০,৪০০	১০৫,৪০০	২২৩,২৭৫		
১৯৪১-৪২	৩,৩৮১,০১০	১,০৪২,৮১৫	৯৭৩,৫০০	১১৬,৬৯৫	১৬০,১৭৫		
১৯৪৪-৪৫	২,০৭৭,০৭৭	১,৮১৪,৮৮৪	১৪,৫৭,২২৪	১৪৩,০০৮	৮৬,৭৭৭	১৮৮,৩৫১	৩৬৭,৮৯০

ঘনবসতিপূর্ণ কৃষি প্রধান দেশে যেখানে কর্ষণযোগ্য ভূমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেখানে একই জমিতে বিভিন্নপ্রকার শস্য উৎপাদন ও একাধিক চাষের প্রবর্তন করা উচিত। কিন্তু এই জেলায় দো-ফসলি জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, কৃষিজমির দশ ভাগের মাত্র একভাগ। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত দো-ফসলি জমির আয়তন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু ১৯৩৫ সালের পর হইতে ইহার আয়তন আবার কমিতে থাকে। ১৯৪১-৪২ সালে দো-ফসলি জমির আয়তন দশবৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালের ঐরূপ জমির আয়তন অপেক্ষা অনেক কম ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয় (মানচিত্র ৯)।

১৯৪১-৪২ সালে ১৬০,১৭৫ একর, অর্থাৎ সমগ্র চাষের জমির ১৬ ভাগ পতিত জমি ছিল। অন্যান্য বৎসরে আরও বেশী আবাদী-জমি পতিত-জমি রূপে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালে সমগ্র আবাদী-জমির শতকরা ৫৩ ভাগে কোন প্রকার চাষ করা হয় নাই। জেলার গত বন্দোবস্তের সময়ে পতিত-জমির আয়তন খুবই কম ছিল, শতকরা মাত্র ৪ ভাগ। যদি জমিকে প্রতি বৎসর স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে সার দিয়া সতেজ না রাখা হয় তবে মাটির ক্ষয় হয়, এবং এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জমিকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়,

তখন জমি পতিত রাখার নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়া জমিতে প্রচুর



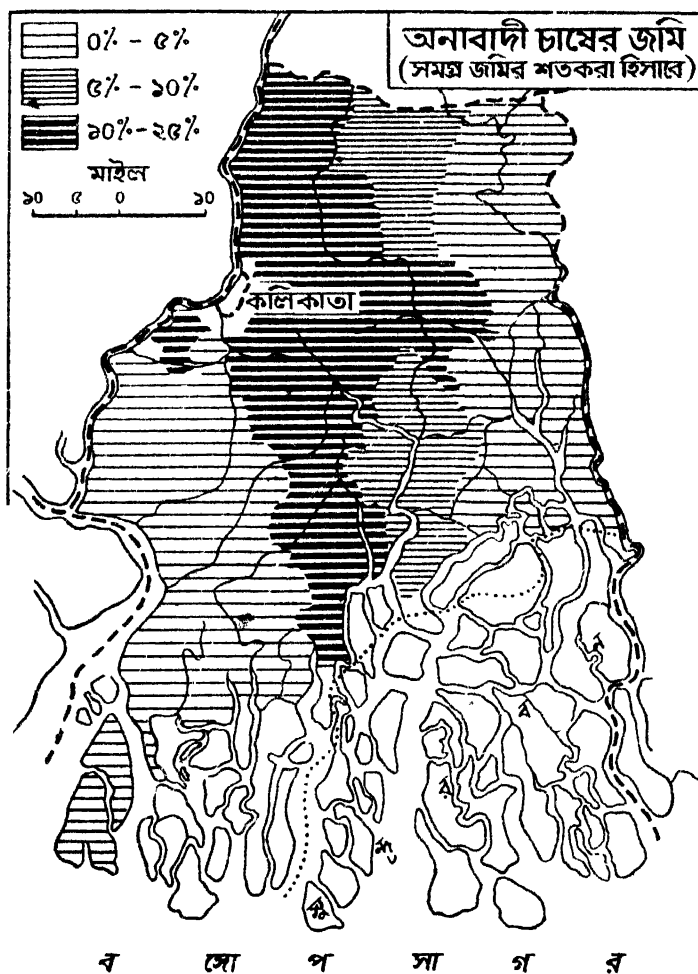
মানচিত্র ৯—দো-ফসলি জমি।

[এই প্রকার জমি বিশেষ কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। একটু আধটু প্রায় সবত্র দেখা যায়।]

সার দেওয়ার এবং বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্নপ্রকার কৃষিজদ্রব্য উৎপাদন করার প্রথা প্রবর্তন করা হয়। যেহেতু দেশের এই অংশে নদীগুলি বেনোজমিতে পলিমাটি ফেলিয়া জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে অপারগ, এবং দারিদ্র্যের জন্য কৃষকেরা উপযুক্ত পরিমাণে কৃত্রিম সার দিতে অসমর্থ, সেই জন্য কিছু পরিমাণ জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ১৯২৯-৩০ সালের মত অতবেশী জমি পতিত রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বাঁধের প্রতি অবহেলা ২৪ পরগণার পতিত জমি বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অসংখ্য মাটির বাঁধ আছে; তাহাদের যথোপযুক্ত সংস্কার না হওয়ার ফলে লবণাক্ত জল সহজেই জমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাষের জমিকে একেবারে অনুর্বর করিয়া দেয়। ১৯৪১ সাল হইতে গভর্ণমেণ্টের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, বহুস্থানে পতিত জমির উন্নয়ন করা হইয়াছিল, এবং ফলে চাষের জমির আয়তন যথেষ্টই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সমস্যার এখনও সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই, যদিও ১৯৪৫ সালে পতিত জমির আয়তন অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক কম দেখান হইয়াছে।

১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪২ সালের মধ্যে প্রায় ৬৩১,৮৪০ একর চাষের জমিতে, অর্থাৎ সমগ্র চাষের জমির শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগে কোন প্রকার চাষ আবাদ করা হয় নাই (মানচিত্র ১০)। ইহার এক তৃতীয়াংশ নানা ধরণের ঝোপ,

ঝাড়ে পরিপূর্ণ। অবশিষ্টাংশ জমি পতিত রাখা হইয়াছিল। এই বিশাল পরিত্যক্ত জমির সদ্ব্যবহার করা উচিত।



মানচিত্র ১০—পতিত চাষের জমি।

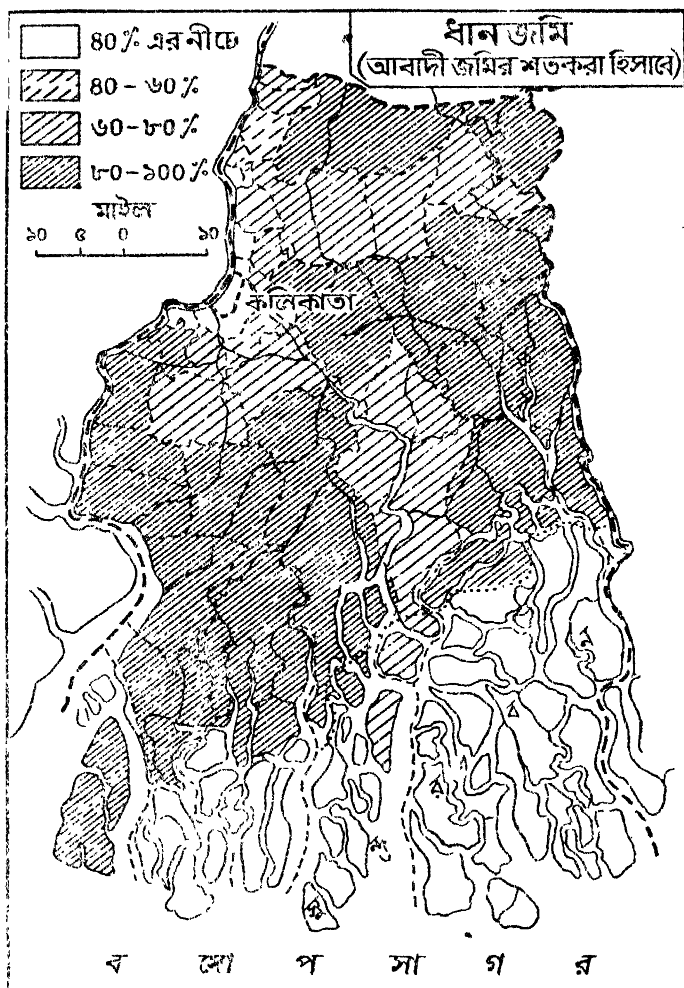
১৯৩৯ সালের পূর্বে সরকারী হিসাব অনুযায়ী কর্ষণ-যোগ্য

অথচ কর্ষিত হয় নাই এরূপ ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে এই প্রকার অবহেলিত জমির আয়তন বর্তমান আয়তনের অর্ধেকেরও কম ছিল। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একবার যে জমি কর্ষিত হইয়াছে তাহাকে পুনরায় চাষের যোগ্য সহজেই করা যাইতে পারে। কাজেই ১৯৪৪-৪৫ সালে কর্ষণযোগ্য অকর্ষিত ভূমির আয়তন যে বহুলপরিমাণে কমিয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

চাষের অযোগ্য জমিও ২৪পরগণা জেলার বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে। ১৯২৯-৩০ হইতে ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে এই প্রকার জমির আয়তন একভাবেই ছিল, প্রায় ৫৭৩,০০০ একর, ইহার মাত্র এক পঞ্চমাংশে গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশের সম্যক উন্নতি সাধন করিতে পারিলে খাদ্যসমস্যার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক যে দূর হয়, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪৪-৪৫ সালে দেখা যায় যে, এই প্রকার জমির আয়তন যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

এই জেলার কৃষিজ দ্রব্যগুলিকে খাদ্য শস্য ও শিল্পে ব্যবহৃত শস্য—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে (তালিকা ৭ দ্রষ্টব্য)। খাদ্য শস্যই এই জেলার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য এবং ইহাদের মধ্যে ধানই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ধানের চাষ জেলার সর্বত্র হইয়া থাকে (মানচিত্র ১১)। জেলার উত্তরাঞ্চলে ছোট ছোট ধানের ক্ষেত, এবং দক্ষিণে,

সুন্দরবনে, সীমাহীন বিশাল ধানজমি দেখিলে চাষীদের কতই



মানচিত্র ১১—বিভিন্ন অঞ্চলে ধানজমি।

প্রায় সর্বত্রই কৃষি জমির অধিকাংশই ধান জমি ; কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়]

তালিকা ৭

বিভিন্ন শস্য জমি

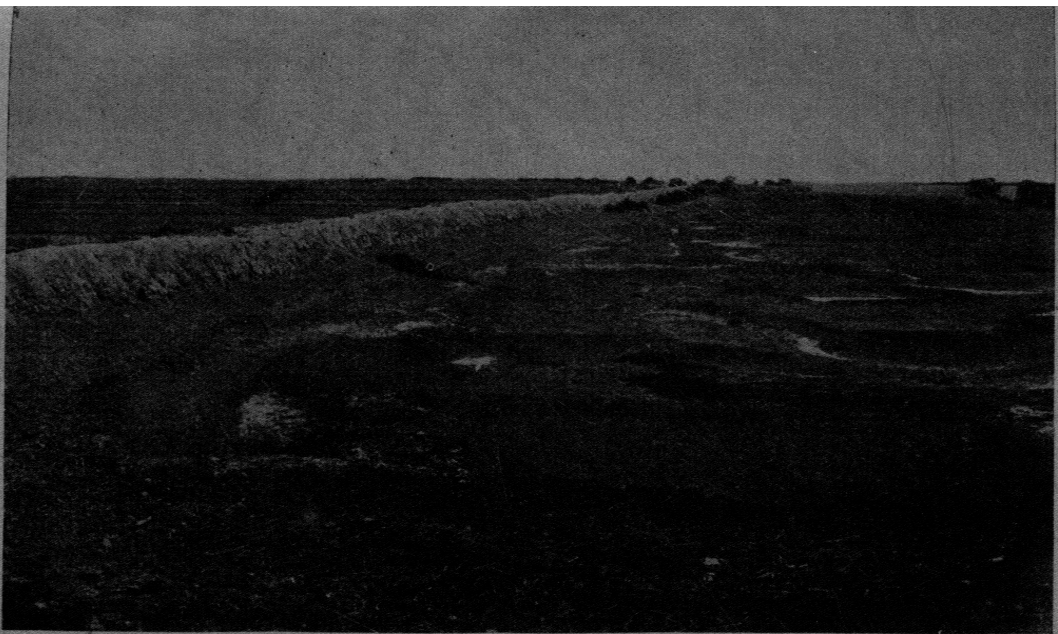
[একর হিসাবে]

	ধান	ডাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য	পাট	তৈলবীজ	মসলা	আক	শাকসব্জী প্রভৃতি
১৯২৯-৩০	৬৯১,১০০	২৯,৩০০	৬৮,০০০	১,৭০০	৩,১০০	১,৯০০	১৬,৮০০
১৯৩০-৩১	৭৩১,২০০	২৮,১০০	৬৯,০০০	১,৮০০	৩,১০০	২,০০০	১৮,৬০০
১৯৩১-৩২	৮০৩,৪০০		৪৫,০০০				
১৯৩২-৩৩	৮০৫,৬০০	২৭,১০০	৪২,০০০		৩,১০০	২,৫০০	১৮,৬০০
১৯৩৩-৩৪	৮১০,১০০		৬১,০০০	২,০০০			
১৯৩৪-৩৫	৭৮৯,২০০		৫৭,০০০			২,৭০০	১৮,৫০০
১৯৩৫-৩৬	৭৮৫,২০০	১৬,৪০০	৪৫,০০০		২,৩০০	২,৮০০	১৭,৬০০
১৯৩৬-৩৭	৭৯৪,২০০	১৫,০০০	৫৩,০০০	১,৯০০	২,৮০০		১৭,০০০
১৯৩৭-'৮	৮৩৪,৯০০	২১,২০০	৪২,০০০	১,৫০০		২,৭০০	১৮,৭০০
১৯৩৮-'৯	৯৪৯,৪০০		৪০,০০০			৩,২০০	১৮,৭০০
১৯৩৯-৪০	৯৪১,০০০	২১,০০০	৩০,০০০	১,৫০০	২,৪০০	২,৫০০	১৮,৪০০
১৯৪০-৪১	৯১১,০০০		৪৫,০০০				১৮,·০০
১৯৪১-৪২	১,০১২,৮০০	২১,২০০	২৫,০০০	১,৪০০		২,৬০০	১৮,৫০০
১৯৪২-৪৩	১,০১০,০০০	২৩,২০০	৩২,৬০০	২,০০০	?	২,৬০০	?
১৯৪৩-৪৪	১,১৬৮,২০০	২০,৪০০	৩৪,০০০	২,৫০০	?	২,৬০০	?
১৯৪৪-৪৫	১,৩২৪,৭৩৭	১০১,৪০১	২৯,৩৬১	৪,০৫৭	১,৩৬৪	১,৫৩৭	৫৮,৯০৬

না আনন্দ হয়। সমগ্র কর্ষিত ভূ-ভাগের শতকরা ৯৯ভাগ জমিতে যে ধান চাষ করা হয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ১৯৪৪-৪৫ সালে ধানজমির আয়তন কিঞ্চিদধিক ১৩ লক্ষ একর ছিল। একই শস্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকিলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়, এবং শস্যের ক্ষতিকারক ছোট ছোট কীট পতঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে। এই কারণেই ২৪পরগণার জমির উৎপাদন শক্তি বড়ই কম; প্রতি একরে মাত্র ১৪ হইতে ২০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। ১৯২৯-৩০ সালে ধানের চাষ শতকরা ৯৪ ভাগ জমিতে, অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৫ সালের মতই ছিল। বর্তমানে অধিক পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করিবার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ১০১,৪০১ একর জমিতে, অর্থাৎ ধান জমির শতকরা প্রায় ৮ ভাগে মুসুর, মটর ও অন্যান্য খাদ্যশস্য জন্মান হইয়াছিল। পাট একটি প্রধান শিল্পে ব্যবহৃত শস্য। ১৯৪৪-৪৫ সালে ২৯,৩৬১ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পাটের জমির আয়তন বর্তমান আয়তনের দ্বিগুণের কিছু বেশী ছিল। পাটের পরেই ফল মূল ও শাকসব্জীর স্থান। কলিকাতার বাজারে ইহাদের চাহিদা খুব বেশী। ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রায় ৫৮,৯০৬ একর জমিতে শাকসব্জী ও ফলমূলের চাষ হইত। তৈলবীজ, লঙ্কা, ইক্ষু ইত্যাদি সাধারণত অল্প পরিমাণে গৃহে ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই তিন রকমের শস্য মোট ৬,৯৫৮ একর জমিতে উৎপন্ন করা হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালে লঙ্কা ও আকের চাষ কিছু বেশী ছিল।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানেও জমিদার শ্রেণী আছে। তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দুই হাজার এষ্টেটের মালিক। এই জমিদারীগুলি সমগ্র জেলার অর্ধেকেরও বেশী স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের জমিদারীর সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; বিভিন্ন লোকের নিকট তাঁহারা আবার চিরস্থায়ীভাবে এই জমির বন্দোবস্ত দিয়াছেন, এবং শেষোক্ত জমীদাররা আবার আর এক শ্রেণীর লোকের সহিত অনুরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই ভাবে জমির জায়গীর প্রথা চলিয়াছে। সাধারণত তৃতীয়বার হস্তান্তরের পরেই জমি কৃষক প্রজার হাতে আসে এবং বস্তুত পক্ষে তাহাকেই কৃষি-জমির মালিক বলা চলে। এই সমস্ত কৃষকেরাই সমগ্র জেলার অর্ধেক ভূখণ্ড, অর্থাৎ ১,৫৫১,৩০৯ একর জমি ভোগ দখল করিয়া থাকে। তাহাদের জোতজমা ৮১১,৩৫০ ভাগে বিভক্ত। গড়ে প্রতি জোত-জমার আয়তন এই জেলায় অত্যন্ত কম, মাত্র ১'৯ একর।

চাষী জোতদারেরা আবার বীজ বপন ও শস্য কর্তনের সময় বহুসংখ্যক কৃষাণ মজুর নিযুক্ত করে। ১৯৩১ সালে ১৯৯, ১৫৭ অর্থাৎ সমগ্র চাষীর শতকরা ৪০'২ ভাগ কৃষাণ মজুর নিয়মিত ভাবে কাজে নিযুক্ত ছিল। গত দুর্ভিক্ষের সময় এই শ্রেণীই অত্যন্ত নির্মমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের সংখ্যাল্পতার জন্যই পরে উপযুক্ত পরিমাণ একর জমিতে শস্যের চাষ করা সম্ভবপর হয় নাই।



ফটোচিত্র ২৩—মুড়ীগঙ্গা ও তীরবর্তী মাটির বাঁধ

[কাকদ্বীপের পাশ দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার এই খাতটির (ছবির ডান পাশে, দূরে) লবণাক্ত জল যাহাতে ধান জমির (ছবির বাম পাশে, দূরে) মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সে জন্য একটি মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। চিত্রে দেখা যাইতেছে, এই বাঁধটি বাম পাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সোজা নদীর দিকে গিয়াছে। এরূপ অনুচ্চ ও অপশ্রস্ত বাঁধের পক্ষে নদীর নোনা জল প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী নহে। নদী ও বাঁধের মধ্যে সাদা সাদা চকচকে নুন মাটির উপর জমিয়া আছে, চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১৬, ৫৮, ১১০)]



ফটোচিত্র ২৪—সুন্দরবনের উন্নয়ন—গোসবা গ্রাম

[স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটনের চেষ্টায় সুন্দরবনের এই অংশকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নয়ন করা হইতেছে। বৃষ্টির জলকে এই চিত্রে প্রদর্শিত ঝিলের মধ্য দিয়া নদীতে নিকাশ করা হয়। ঝিলের ধারে নারিকেল ও সুপারী গাছ রোপন করা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ৬৫, ১০৯)]

সুন্দরবন অঞ্চল সরকারের সম্পত্তি। পূর্বে সরকার প্রকাশ্য নীলামে জমি ভাগ করিয়া চাষ আবাদের জন্য দিতেন; কিন্তু এখন সেই প্রথা প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বনভূমিকে সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গৃহপালিত জীবজন্তু

যদিও গৃহপালিত গবাদি পশুরা ২৪পরগণা জেলার কৃষকদের বিশেষ উপকারে আসে, তথাপি পশু পালনের জন্য কোন চেষ্টাই নাই। গ্রামাঞ্চল ও শহরতলীতে হালচষা ও ভারী ভারী বোঝাই গাড়ী টানা প্রভৃতি কাজের উপযুক্ত প্রধান জন্তু হিসাবে একমাত্র বলদগুলিকেই ধরা যাইতে পারে। শহরে মহিষগুলিও ভার বহনকারী জন্তুর কাজ করে। ১৯৪০ সালে এই জেলার গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় ১,০৭৯,৪৯১ ছিল; এবং তাহাদের অধিকাংশই, প্রায় ১০ লক্ষ, গ্রামাঞ্চলে ছিল। বলদ এবং মহিষের সংখ্যা ৩৮৫,৯৬১, অর্থাৎ সমগ্র গবাদি পশুর সংখ্যার শতকরা ৩৬। সংখ্যায় যথেষ্ট হইলেও ইহাদের অধিকাংশই ক্ষীণজীবী ও কার্যে অপটু। যথোপযুক্ত যত্ন ও খাদ্যের অভাবেই ইহাদের এরূপ অবস্থা। পশু চারণের ভূমি ২৪পরগণা জেলায় একেবারে নাই বলিলেই চলে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চলে গবাদি পশুরা শুষ্ক ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা অবশ্য ধানের বিচালি কাটিয়া, এবং তাহার সহিত খোল ও কলাইসিদ্ধ মিশ্রিত করিয়া গরুকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

দুগ্ধবতী গাভী গুলির সাহায্যে এই জেলার দুগ্ধ সরবরাহের কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৪০ সালে বাছুর ছাড়াই ইহাদের সংখ্যা ৪৪০,৫১৭ ছিল। বর্তমানে সুপরিকল্পিত ভাবে এই শিল্পটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখনও দুগ্ধ, দধি ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার বাজারে চাহিদা মত আমদানী হইতেছে না।

ছাগল এবং ভেড়া, গবাদি পশু অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়। ইহাদের সংখ্যা ২৮৪,৪৮২ ; ভেড়ার সংখ্যা মাত্র ১০,০০০। এই প্রাণীগুলি প্রধানত মাংস এবং সামান্য পরিমাণ দুগ্ধের যোগান দেয়।

লাঙ্গল, গরুর গাড়ী এবং নৌকা

এই জেলার কৃষকেরা কাষ্ঠফলক কিংবা লৌহফলকের লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করে। এই ধরণের লাঙ্গলগুলি প্রকৃত পক্ষে নীচের মাটিকে ভালভাবে উপরে তুলিয়া আনিতে পারে না ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরের মাটিকে দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া দেয়। কাজেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া মাটির নীচে এই লাঙ্গল গুলি ৪ ইঞ্চির অধিক প্রবেশ করিতে পারেনা। সুতরাং প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়।

এই লাঙ্গল গুলি বিশেষ কার্যকরী না হওয়ায় বীজ বপন বা চারা লাগাইবার পূর্বে একই জমিকে বার বার কর্ষন করিতে হয়। লাঙ্গলের সংখ্যাও যথেষ্ট নহে। ১৯৪০ সালে ইহার

সংখ্যা ১৬৫৫৮০, অর্থাৎ প্রতি ১০ একর জমিতে মাত্র একখানা লাঙ্গল ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে ভাল রাস্তা নাই ; কাজেই নৌকা এবং গরুর গাড়ীই কৃষকদের একমাত্র যাতায়াতের উপায়। ১৯৪০ সালে মাত্র ৩৩,৫৭৬ গরুর গাড়ী এবং ৮,৮৬৮ নৌকা ছিল। এত বড় একটি জেলার পক্ষে আরও অনেক বেশী গরুর গাড়ী ও নৌকার প্রয়োজন।

তুলনামুলক আলোচনা

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমির কি প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে এবার তাহার আলোচনা করা থাক। কর্ষিত জমি কোথায় কত আছে তাহা শতকরা হিসাবে ৮নং তালিকায় দেখান হইয়াছে। সাধারণত উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সমগ্র জমির অনুপাতে কৃষি জমির আয়তন সমধিক ; বারাসাত বসিরহাট অঞ্চলে শতকরা ৭৫ ভাগ, এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ৭৭ ভাগ। শিল্পপ্রধান শহরতলী অঞ্চলে চাষের জমির পরিমাণ সব চেয়ে কম ; কিন্তু সেখানেও অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে চাষ করা হয়। প্রাচীন সুন্দরবনে চাষের জমি (শতকরা ৬৬) আবাদী সুন্দরবনের অপেক্ষা অধিক (শতকরা ৬১)। কাজেই, সুন্দর বনে আরও অধিক পরিমাণে জমির যে চাষ সম্ভবপর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (মানচিত্র ৮ দ্রষ্টব্য)।

কৃষি জমির অনুপাতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব হুগলীতটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, প্রতি বর্গমাইলে কিঞ্চিদধিক আট হাজার। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে জন বসতি স্বভাবতঃ কম। কৃষিপ্রধান

অঞ্চলগুলির মধ্যে আবাদী সুন্দর বনে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম (৮৮৩) এবং দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী (১৮৬৫)। যদিও এই জেলায় আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর অঞ্চলে প্রথম দিকেই জনসাধারণের বসবাস আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি প্রতিবর্গ মাইল কৃষিজমির অনুপাতে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা আবাদী সুন্দরবনের জনসংখ্যা অপেক্ষা খুব বেশী নহে। পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলের নদীগুলি মজিয়া যাওয়ার ফলেই লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় নাই। আরও দক্ষিণে অবস্থিত সমভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় সমান; তবে এই অঞ্চলে উত্তর হইতে যতই দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে, বসতি কমিয়া আসিতেছে।

আবাদী সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থানেই বড় বড় প্লটে চাষ করা হয়। প্রত্যেক চাষীর গড়ে ২ হইতে ৬ একরের মধ্যে চাষের জমি আছে। ট্র্যাকটর ও অন্যান্য কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পক্ষে এই অঞ্চল বিশেষ উপযোগী। আবাদী সুন্দরবনের উত্তরে প্রতি জোতের গড় আয়তন ইহা অপেক্ষা সামান্য কিছু কম, এবং জেলায় অন্যত্র আরও কম, এক হইতে দুই একরের মধ্যে। শিল্প-প্রধান অঞ্চল, হুগলীতটে অবশ্য এক একরের বেশী জমি বিশেষ কাহারও নাই।

পতিত চাষের জমি জেলার প্রায় মধ্য দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত (মানচিত্র ১০)। কলিকাতার উত্তরে হুগলী তটে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। কাজেই, এখানে প্রচুর ফলমূল ও শাকসব্জী উৎপাদন করা

তালিকা ৮

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জমির পরিমাণ

	কর্ষিত আবাদী জমি (সমগ্র ভূমির শতকরা ভাগ)	লোক সংখ্যা (প্রতি বর্গমাইল আবাদী জমির হিসাবে)	জোত প্রতি জমির পরিমাণ (একর) সর্বোচ্চ	জোত প্রতি জমির পরিমাণ (একর) সর্বনিম্ন	অকর্ষিত আবাদী জমি (সমগ্র ভূমির শতকরা ভাগ)	কর্ষণের অযোগ্য জমি (সমগ্র ভূমির শতকরা ভাগ)
(১) হুগলী তট	৫০	৮,৩৫২	১'০৩	০'৫২	২১	২৯
(২) আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর সমভূমি	৭৬	৯০৩	২'০১	১'৬৮	১৩	১১
(৩) বারসাত বসিরহাট সমভূমি	৭৫	১,৩৭৪	১'৭৭	১'১৮	১০	১৫
(৪) দক্ষিণ সমভূমি	৭৭	১,৮৬৫	১'৭৩	০'৯৮	১০	১৩
(৫) প্রাচীন সুন্দরবন	৬৬	১,২৩৮	৪'৪৯	১'৩৯	১২	২২
(৬) আবাদী সুন্দরবন	৬১	৮৮৩	৫'৯৭	২'৪৪	১৬	২৩

যাইতে পারে। জেলার দক্ষিণে অবস্থিত সমভূমি অঞ্চলে এবং ইছামতী নদীর উভয় পার্শ্বের উর্বর জমিতে ব্যাপক ভাবে চাষ আবাদ হইয়া থাকে, কাজেই এই অঞ্চলে অব্যবহৃত কৃষি ভূমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। আবাদী সুন্দর বনের পূর্বাঞ্চলে কর্ষণ-যোগ্য বিস্তর পতিত জমি রহিয়াছে। সুতরাং এ অঞ্চলেও আরও অধিক পরিমাণ ভুমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করা যাইতে পারে।

তথাকথিত কর্ষণের অযোগ্য ভুমি কোথায় কত পরিমাণে আছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শহরতলী অঞ্চলে এই ধরণের জমির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এবং আমডাঙ্গা-স্বরূপ নগর অঞ্চলে সবচেয়ে কম। শেষোক্ত অঞ্চলে জমির ব্যাপকভাবে সদ্ব্যবহার করা হয় বলিয়াই চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ এত অল্প। দক্ষিণ সমভূমি এবং বারাসাত বসিরহাট অঞ্চলেও ঐ একই কারণে কর্ষণের অযোগ্য জমি খুব বড় একটা দেখা যায় না।

প্রত্যেক অঞ্চলেই আউস অপেক্ষা আমন ধানের চাষ বেশী হয়। দক্ষিণ সমভূমিতে সমগ্র জমির অনুপাতে আমন জমি জেলার মধ্যে প্রথম স্থান, এবং চাষের জমির অনুপাতে আমন জমি জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। আবাদী সুন্দরবনে আমন ছাড়া আর কিছু প্রায় জন্মায় না বলিলেই চলে। প্রাচীন সুন্দরবনে আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগেই আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর সমভূমিস্থ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে আমন জন্মায় না, চাষের জমির শতকরা মাত্র ৬০ ভাগে আমন ধানের চাষ

হইয়া থাকে। শিল্প প্রধান অঞ্চলে আবাদী জমির মাত্র এক চতুর্থাংশে আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। জেলার উত্তরাংশে অন্যান্য যে কোন অংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আউস ধান উৎপন্ন হয়। আবাদী সুন্দরবন অঞ্চলে মাথা পিছু ধান উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক; জেলার অন্যান্য অঞ্চলে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, এই একটি অঞ্চল হইতে প্রায় সম-পরিমাণ ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন সুন্দরবনেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিল্পপ্রধান হুগলী তট অঞ্চল ছাড়া জেলার অন্যান্য অঞ্চলে, মানুষের যতটা চাল দরকার প্রায় ততটাই জমি হইতে পাওয়া যায়, ঘাটতির পরিমাণ খুবই কম। একমাত্র হুগলীতটই একটি প্রধান ঘাটতি অঞ্চল; কৃষিপ্রধান অন্যান্য অঞ্চল হইতে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

সমগ্র চাষের জমির অনুপাতে পণ্যে ব্যবহৃত অন্যান্য কৃষিজ পদার্থ এই জেলায় কি পরিমাণে জন্মে, তাহার আলোচনা এইবার করা যাক। এইগুলির মধ্যে পাটই সর্বপ্রধান কৃষিজপদার্থ; ইহার চাষ কোথায় কত পরিমাণে হয় তাহা ১২নং মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। জেলার উত্তর অঞ্চলেই প্রধানত পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত অঞ্চলে এবং দক্ষিণ সমভূমিতে ডাল ও অন্যান্য খাদ্য শস্য প্রচুর জন্মায়। হুগলীতটে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে ফল এবং শাকসব্জীর চাষ হয়। ইহার পরেই বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চল।

বারুইপুর ও ভাঙ্গরের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতেও কলিকাতায় রপ্তানীর জন্য প্রচুর ফল ও শাকসব্জী উৎপন্ন হয়।

কৃষি কার্য্যে ব্যবহৃত লাঙ্গল, গরুর গাড়ী ও নৌকার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ অঞ্চলে লাঙ্গলের সংখ্যা সর্বাধিক; ইহার কিছু কম প্রাচীন সুন্দরবনে দেখা যায়। বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলেও লাঙ্গলের সংখ্যা প্রয়োজনারূপ আছে। আবাদী সুন্দরবন অঞ্চলে গড়ে লাঙ্গল সংখ্যা ৬৬ হইতে ১০৭; এবং আমডাঙ্গা-স্বরূপ নগরে ২৪ হইতে ৯৮-এর মধ্যে দেখা যায়। হুগলীতটে অধিক সংখ্যক লাঙ্গলের প্রয়োজন নাই, কাজেই এখানে লাঙ্গলের সংখ্যাও কম।

গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ী বা নৌকাই একমাত্র সম্বল। জেলার উত্তরস্থ অঞ্চলে গরুর গাড়ীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক; কারণ মেটো ও পাকা রাস্তা এ অঞ্চলে যত আছে অন্য কোন অঞ্চলে তত নাই। এখানে নৌকার বিশেষ প্রচলন নাই। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রেই কাটা খাল থাকায় গরুর গাড়ীর অপেক্ষা নৌকার উপরেই লোকেরা অধিক নির্ভরশীল। সুন্দরবনের কোন কোন অংশে নৌকা এবং গরুরগাড়ীর অভাবে কৃষিকার্য ভাল ভাবে হয় না।

দক্ষিণ সমভূমিতে গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাধিক; এবং আবাদী সুন্দর বনে সর্বাপেক্ষা কম। জেলার দক্ষিণাংশে ছাগল অথবা ভেড়া বিশেষ দেখা যায় না। ইছামতীর তীরেই ইহাদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

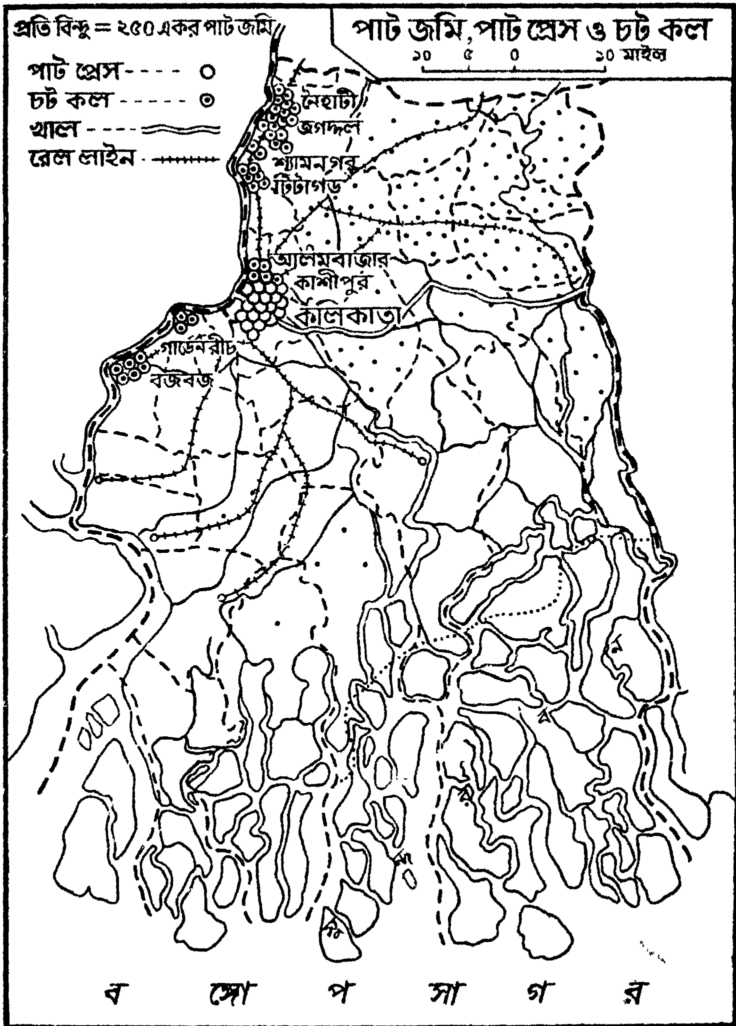
(১) হুগলী তট অঞ্চল

এই অঞ্চল জেলার উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার (হুগলী নদীর) তীর ধরিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল। প্রধান রেলপথকে ইহার পূর্ব সীমা রেখা ধরা যাইতে পারে। প্রস্থে ইহা এক হইতে দুই মাইলের মধ্যে। হুগলী নদীর পশ্চিমে হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা অবস্থিত। এই নদীটিকে জার্মানীর রুর প্রদেশে অবস্থিত রাইন নদীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু রাইনের উপত্যকায় যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে এখানে তাহার একান্তই অভাব। নিকটবর্তী রাণীগঞ্জের কয়লাখনি হইতে নদীপথে কয়লা আনয়ন করা যায় না। কারণ কয়লা খনি অঞ্চল হইতে আগত হুগলীর একমাত্র উপনদী, দামোদরে বৎসরের সকল সময় যথেষ্ট জল থাকে না। উপরন্তু, জার্মানীর মত বাংলাদেশে কারখানা শিল্পগুলির বিশেষ কোন মূল ভিত্তি নাই। মূলধন বা শ্রমিক কোনটিই বাংলার নিজস্ব নহে। বেশীর ভাগ কলগুলিরই মালিক ইংরাজ বা স্কচ, এবং শ্রমিকেরা বাংলার বাহিরের লোক। কাজেই, এই ধরণের শিল্প যতই উন্নত হউক না কেন ইহা স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে বিশেষ কোন সাহায্য করে নাই। অতএব, আমরা ইহাকে বাংলার

শিল্পোন্নতির যথার্থ লক্ষণ বলিয়া ধরিতে পারি না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর অবশ্য অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে।

২৪ পরগণার প্রায় সমস্ত চটকলগুলিই উত্তরে নৈহাটি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত এই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চটকলগুলির ব্যবহারের জন্য বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পাট খোলা অবস্থায় আসে। কাজেই, কলি-কাতার পূর্ব্ব প্রান্তে খালের ধারে এবং উত্তরে কাশীপুর অঞ্চলে বহু পাটকল (জুটপ্রেস) দেখা যায়। এই কলগুলিতে পাটের বাঁধাই হইয়া বিভিন্ন চটকলে পাটের গাঁট পাঠান হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে নৈহাটির নিকট গৌরীপুরে এই জেলায় সর্বপ্রথম চটকল স্থাপিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রায় ১২টি চটকলে কাজ চলিতে থাকে। এখন চটকলের সংখ্যা তাহার প্রায় চতুর্গুণ। প্রধানত চারিটি স্থানে ইহারা কেন্দ্রীভূত—দুইটি কলিকাতার উত্তরে, তৃতীয়টি কলিকাতার শহরতলী অঞ্চলে, এবং চতুর্থটি দক্ষিণে বজবজের সন্নিকটে অবস্থিত। প্রথম কেন্দ্রটি চন্দননগরের অপর পারে হুগলী নদীর একটি বিখ্যাত বাঁকে, ভাটপাড়া হইতে শ্যাম নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় কেন্দ্র খড়দহ এবং টিটাগড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই চটকলগুলি প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। কোন কোন বৎসর অংশীদারদের মূলধনের শতকরা ১০০ টাকার উপরেও মুনাফা দেওয়া হয়।[১] দুঃখের বিষয়

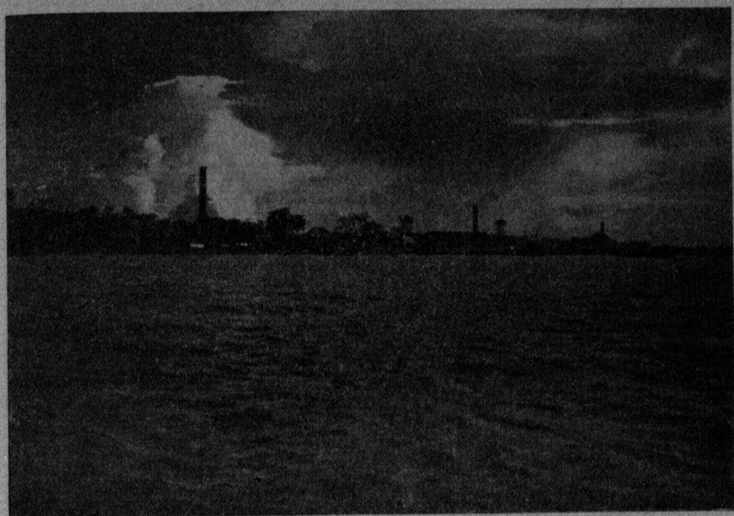
১। বাংলা বিভক্ত হওয়ার ফলে পাটশিল্প যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।



মানচিত্র ১২—পাটজমি, পাট ও চটকল।
[গঙ্গার তীরেই অধিকাংশ পাট ও চটকল গুলি অবস্থিত
জেলার মাত্র উত্তরাংশে কিছু পাট উৎপন্ন হয়।]

এইরূপ লাভের অধিকাংশ টাকাই ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়।[২] প্রথম কেন্দ্রের অন্তর্গত চারিটি চটকল এক বৎসরে ১ কোটি টাকা লাভ করিয়াছিল ; এবং দ্বিতীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত দুইটি চটকলের লাভ প্রায় অর্দ্ধ কোটি টাকা হইয়াছিল। এই চটকলগুলির লাভের সামান্য অংশ পাইলে জেলার বহুবিধ সংস্কার করা সহজেই সম্ভবপর হইত। চটকলের সন্নিকটে অবস্থিত জলাগুলি হইতে জল বাহির করিয়া দিয়া চাষের জমি বাড়াইতে পারিলে, শ্রমিকদের জন্য অন্য স্থান হইতে খাদ্য শস্য আনার প্রয়োজনই হইত না। চটকলের সংলগ্ন জমিরও উন্নতি করা যাইতে পারিত। শ্রমিকদের বাসস্থান অতি নিকৃষ্ট ধরণের ; এখানকার শ্রমিকেরা ইংলণ্ড, জার্মানী বা আমেরিকার শ্রমিকদের ন্যায় জীবনের কোন আনন্দই উপভোগ করিতে পায় না। বাঙ্গালী মজুরেরা কেন কলে কাজ করিতে ভালবাসে না, ইহা তাহার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে যদি স্থানীয় বাঙ্গালী মজুরদের মিলের কাজে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে চাষের জমির উপরে এত অধিক সংখ্যক জন-সাধারণের নির্ভর করিতে হইবে না, এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত সহস্র সহস্র শ্রমিকদের কার্যে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনই হইবে না। এই ভাবে খাদ্য সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে।

২। কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর উপর ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শুল্ক ধার্য্য আছে ; ইহা হইতে গভর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থাগম হয়।



ফটোচিত্র ২৫—গঙ্গার তীরে কাঁকিনাড়া ও ভাটপাড়ার চটকল (পৃষ্ঠা ৭৪)



ফটোচিত্র ২৬—
ব্যারাকপুরে
গঙ্গার উপর
গান্ধীঘাট

[ব্যারাকপুরে গঙ্গায় মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জনের পর ব্যারাকপুর তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ঘাটের উপর নির্মিত নূতন মন্দিরাকৃতি স্মৃতিসৌধ চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ৮১)]

ফটোচিত্র ২৭—ওরিয়েণ্টাল গ্যাস ওয়ার্কস্, কলিকাতা (পৃষ্ঠা ৪৮)



ফটোচিত্র ২৮—হুগলীতট অঞ্চলে শ্রমিকদের ব্যারাকবাড়ী
[ভাটপাড়ার এই ব্যারাকবাড়ীর সম্মুখস্থ জমি আগাছায় পূর্ণ। (পৃষ্ঠা ৭৬)]

একটি মাত্র কাপড়ের কল ব্যতীত বাকী সমস্তগুলিই কলিকাতার উত্তরে পানিহাটি ও গারুলিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। একটি কাগজের কল টিটাগড়ে এবং অপর দুইটি ভাটপাড়ার সন্নিকটে কাঁকিনাড়ায় অবস্থিত। এই অঞ্চলে ১১টি কেমিক্যাল ওয়ার্কস আছে, তন্মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এইগুলি প্রধানত কলিকাতার পূর্বদিকে খাল অঞ্চলে অবস্থিত। অধিকাংশ কাঁচের ফ্যাক্টরীও এই অঞ্চলেই দেখা যায়। দিয়াশলাই শিল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঞ্চলের ৬টি দিয়াশলাই কারখানার মধ্যে দুইটিতে দৈনিক একহাজার শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত। এইগুলি কলিকাতার উত্তর শহরতলীতে অবস্থিত। চীনামাটির কারখানা, সাবানের কারখানা, সার তৈয়ারীর কারখানা, রংয়ের কারখানা, লাক্ষার কারখানা, প্রভৃতি ছোট ছোট শিল্পগুলির অধিকাংশই কলিকাতার খাল অঞ্চলে অবস্থিত।

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার রেল-কারখানাই বৃহত্তম। সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির অধিকাংশই ছোট প্রতিষ্ঠান, সংখ্যায় তাহারা প্রায় একশত। ইহাদের কোনটিতেই এক হাজারের অধিক শ্রমিক নাই, এবং শতকরা পঞ্চাশটি কারখানায় দৈনিক একশতেরও কম শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া ষ্টীমার ও মোটর গাড়ী মেরামতের কারখানা, কেরোসিন টিনের এবং প্যাকিং বাক্স তৈয়ারীর

কারখানায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ ব্যবহার করা হয়। কামারহাটির সীসার জিনিষ তৈয়ারীর কলে এবং কলিকাতার শহরতলীতে অবস্থিত অ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈয়ারীর কারখানায় সীসা ও অ্যালুমিনিয়াম কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অধিকাংশ চালের কল কলিকাতার শহরতলীতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার আশেপাশে কয়েকটি খাল থাকায় ইহাদের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই খালগুলি দিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে প্রচুর ধান মিল অঞ্চলে নিয়মিতভাবে আসিত। কলিকাতার দক্ষিণে টালীগঞ্জ অঞ্চলে জেলার প্রায় অর্ধেক চালের কল অবস্থিত। কলিকাতার উত্তর প্রান্তে শ্যামবাজার এবং উল্টাডাঙ্গায় খালের ধারেও বহু চালের কল দেখা যায়। টিটাগড়-বারাকপুর অঞ্চলে রেল লাইনের পূর্বদিকে আরও কয়েকটি চালের কল গড়িয়া উঠিয়াছে; তালপুকুর হইতে চানক এবং চন্দনপুরে যাইবার সময় রাস্তার দুই পার্শ্বে এই কলগুলি দেখা যায়। এই চালের কলগুলি আকারে অত্যন্ত ছোট, এবং শ্রমিকের সংখ্যা কলপ্রতি মাত্র ৬০ জন।

কলিকাতা এবং শহরতলীতে মাত্র ৪টি ময়দার কল আছে। এই মিলগুলিতে দৈনিক ১০০ মজুর কাজ করে। নৈহাটির নিকটে একটি মাত্র তিসির তেলের কল আছে। যন্ত্র শিল্পে তিসির তেলের চাহিদা খুব বেশী। অবশিষ্ট তেল কলগুলি সরিষার বীজ হইতে তেল বাহির করে। সরিষার তেল বাঙ্গালী গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। তিনটি বড় বড় বেকারী ও বিস্কুট তৈয়ারীর কারখানা, এবং একটি মদ চোলাইয়ের

ভাটিখানা কলিকাতার শহরতলীতে অবস্থিত। কামারহাটিতে একটি ও কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে আর একটি তামাকের কারখানা আছে।

চামড়ার কারখানা এবং ট্যানারীগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, বাটা কোম্পানীর প্রধান কারখানা নুঙ্গী বা বাটানগরে অবস্থিত। ইহা অতি দ্রুত বাংলা দেশের চর্ম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইতে চলিয়াছে।

কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের চারিটি ষ্টেশন কাশীপুর, ভাটপাড়া, মুলাজোর ও গার্ডেনরীচে অবস্থিত। এই ষ্টেশনগুলিতে কয়লার সাহায্যে জল গরম করিয়া বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয়; পরে বাষ্প চালিত টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

এই অঞ্চলের বহুবিধ সমস্যার সম্যক সমাধান করিতে হইলে ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মহকুমার অন্তর্গত করা আবশ্যক। বর্তমানে ইহা দুইটি বিভিন্ন মহকুমা—সদর ও বারাকপুর, এবং কলিকাতা জেলার অন্তর্গত। উপরোক্ত দুইটি মহকুমার অন্তর্গত থানাগুলিরও নূতন করিয়া সীমারেখা টানা আবশ্যক। বর্তমানে একই থানার একাংশে কলকারখানাগুলি রহিয়াছে; এবং অপরাংশের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত আছে। কলকারখানাপ্রধান অঞ্চলগুলি একত্র করিয়া কয়েকটি নূতন থানা গড়িতে পারিলে থানার রাজকর্মচারীরা শিল্প অঞ্চলের বিশেষ সমস্যার সমাধান কল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন।

এই অঞ্চলের জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে

দেখা যায় যে, নদী তীরবর্তী স্থান সমূহেই অধিকতর লোকের বসবাস ; এবং পূর্বদিকে এই বসতি ক্রমশ হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা ও ভাটপাড়া সহ জেলার প্রধান প্রধান শহরগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত (মানচিত্র ১)। এই শহরগুলিকে কলিকাতা মহানগরীর উপনগর বলিয়া অধুনা প্রতীয়মান হইলেও, ইহারা কলিকাতা সহরের জন্মের বহু পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। জেলার উত্তরে অবস্থিত হালিসহর ভারতে মোগল রাজত্বের সময় প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত ; এবং তখন এই সহরে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে এই শহরটি বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান কৃষ্টি কেন্দ্র ছিল ; তখন ইহার নাম ছিল কুমারহট্ট। জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার পূব গৌরব সম্পুর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে যখন অন্যান্য সহরগুলির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তখন ইহার জনসংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই ; এমন কি ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। শহরের সন্নিকটবর্তী বদ্ধ জলাগুলিতে অসংখ্য অ্যানোফিলিস মশকের জন্ম হইয়া থাকে, এবং ইহারাই মারাত্মক ম্যালেরিয়া ব্যাধি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়। ফলে এই শহরের অধিবাসীদের বর্তমানে স্বাস্থ্য হানি হইয়াছে।

নৈহাটি কিছু দিনের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বাংলাদেশের রাজধানী ছিল। ইহার জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাটপাড়া অপর একটি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান ; এবং বর্তমানে বাংলার একটি প্রধান কৃষ্টিকেন্দ্র। এই

শহরে কতকগুলি কল স্থাপিত হওয়ায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৪১ সালে যখন লোক গণনা করা হয়, তখন দেখা যায় যে, এই শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত টিটাগড় শহরের যেমন দ্রুত একটানা উন্নতি হইয়াছে, তেমন আর কোন শহরের হয় নাই। খড়দহ ও পানিহাটি বাংলার দুইটি ধর্মকেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গোরা সৈন্যদের ব্যারাকের নামানুসারে ব্যারাকপুরের নামকরণ হয়। প্রথম আদম সুমারীর বৎসরে ইহার জনসংখ্যা কলিকাতার জনসংখ্যার প্রায় সমান ছিল; কিন্তু পরবর্তী ৫০ বৎসরে ইহার জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই।

বরানগরের জনসংখ্যা কলিকাতার জনসংখ্যার মতই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে; কারণ বৃহত্তর কলিকাতা উত্তরে বরানগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শহরটি প্রথম হইতেই দক্ষিণ দিকেই প্রসারিত হইতে থাকে। পূর্বদিকে লবণাক্ত জলাভূমি, পশ্চিমে বিরাট হুগলী নদী, এবং উত্তরে ঘন বসতিপূর্ণ স্থান থাকার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। অনুন্নত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে কলিকাতার মত আর কোন শহর পৃথিবীতে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অন্যান্য শহরগুলির সহিতও ইহার বহু বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত ২৪পরগণা জেলার জনপদগুলি দ্রুত কলিকাতার শহরতলীতে পরিণত হইতেছে, এবং কলিকাতা

পৌর-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সহরের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে। সমুদ্রগামী বড় বড় বহু জাহাজ **গার্ডেনরীচ** অঞ্চলে দেখা যায়। গার্ডেনরীচ হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত নদীর ধারে প্রধান প্রধান ডকগুলি অবস্থিত। **আলীপুর** ২৪ পরগণা জেলার সদর সহর। **মাঝেরহাট** একটি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে জংশন; খিদিরপুরের ডক ও আলীপুরের যুদ্ধকালীন বিমান ঘাঁটির সান্নিধ্যের জন্য ইহার প্রাধান্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। **বালীগঞ্জ** কলিকাতার একটি প্রধান শহরতলী; কলিকাতা যাঁহাদের কর্মস্থান, তাঁহাদের অনেকেই এখানে বসবাস করেন। বালীগঞ্জের কৃত্রিম হ্রদ লণ্ডনের হাইড পার্ক ও প্যারিসের বোয়া দ বুলঁর মতই দেখিতে সুন্দর। **টালীগঞ্জ** অঞ্চলও ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে। এখানে বিশেষ ভাবে ইটালঘাটার চতুর্দিকে অনেকগুলি চালের কল আছে। ১৯৩১ সাল হইতে ইহার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণস্থ শহরতলী অঞ্চল **বেহালা** ও **বড়িষা** পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুইটিই ঐতিহাসিক নগর। বড়িষার নিকটবর্তী স্থানে পুরাকালে বাংলার রাজধানী ছিল। কলিকাতার উত্তর শহরতলী অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। দক্ষিণ শহরতলীর মত এই অঞ্চল বাসগৃহ নির্মাণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অবশ্য **দমদমে** প্রচুর খোলা জায়গা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কলিকাতার বহু ধনী ব্যক্তিদের বাগানবাড়ী আছে। দমদমে ভারতের একটি প্রধান এয়ারোড্রোম থাকায়, এই শহরটিকে বাংলাদেশের ক্রয়ডন

বলা চলে। দক্ষিণ হইতে আগত সামুদ্রিক বায়ু কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করার অন্যতম কারণ। ঐ কারণেই শহরের প্রাচীন অংশেও দক্ষিণ খোলা গৃহগুলির বিশেষ একটি আকর্ষণ আছে। দক্ষিণ খোলা বাড়ীতে বাস করিলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা অনুভূত হয় না; সকল সময়েই সুশীতল বায়ু দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর হইতে আসিয়া বায়ুর উত্তাপ কমাইয়া দেয়। কাজেই, ভবিষ্যতে কলিকাতা আরও দক্ষিণে যে প্রসার লাভ করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। হুগলীতট অঞ্চলের দক্ষিণতম প্রান্তে **বজবজ** শহর অবস্থিত। কলিকাতার সহিত ইহার রেলপথ, পাকারাস্তা ও নদীপথে উত্তম যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি ইহার নিকটে বহুসংখ্যক চটকল ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থান বাংলাদেশের একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া বজবজ পেট্রোল সরবরাহের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই শহরের দক্ষিণে হুগলীনদীর পূর্ব তীরে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত নূতন নূতন শিল্প গঠনের উপযোগী জমি রহিয়াছে। ভবিষ্যতে এখানে নূতন নূতন কলকারখানা গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিল্প-প্রধান থানাগুলির এক অংশেই কল-কারখানাগুলি সীমাবদ্ধ; অন্যান্য অংশের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে শেষোক্ত অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। আশা করা যায় যে, সরকারী পরিকল্পনা রচনা করিবার সময়

এই বিষয়গুলি আলোচিত হইবে। কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত বিজপুর, নৈহাটি এবং জগদ্দল, এই তিনটি থানার জলাভূমি হইতে জল বাহির করা একান্ত আবশ্যক, এবং প্রাচীন খাল ও নদীগুলি যাহা এখন মজিয়া গিয়াছে তাহাদের পুনরুদ্ধার করিয়া হুগলী নদীর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। এই অঞ্চলের উত্তর সীমায় মথুরাবিল ও তৎসংলগ্ন বাঘেরখাল সর্বপ্রথমে খনন করা উচিত। ইহাতে কেবলমাত্র কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতিই যে হইবে তাহা নহে, উপরন্তু বর্তমানে অব্যবহৃত বিজপুর থানার এক তৃতীয়াংশ কর্ষণযোগ্য ভূমিতে চাষ আবাদ করা সম্ভবপর হইবে। বিজপুরের দক্ষিণে নৈহাটি ও জগদ্দলের মধ্যে অপর একটি পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত খাল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত ইহা এক সময় ভাবাগাছি, দোগাছিয়া, মাদ্রাইল গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাটপাড়ার সন্নিকটে হুগলী নদীতে আসিয়া মিলিত হইত। এই খালটির সংস্কার একান্ত প্রয়োজন, এবং বারিতি বিলের জল নিঃসারণের জন্য যে খালটি খনন করান হইয়াছিল তাহাকে আরও প্রশস্ত করা আবশ্যক। বারিতি বিলের একেবারে উত্তর প্রান্তে আর একটি খাল খনন করা উচিত; অতীতে একটি খাল এক সময়ে মির্জাপুর ও শ্যামনগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল, এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। উপরোক্ত খালগুলির সংস্কার হইলে আশা করা যায় যে, নৈহাটি, জগদ্দল, নপাড়া, ব্যারাকপুর ও টিটাগড় থানায়

প্রায় ১০ বর্গ মাইল কর্ষণযোগ্য ভূমি, শাক সব্জীর বাগান বা ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার দক্ষিণে খড়দহে যথেষ্ট পরিমাণ কর্ষণযোগ্য উর্বর ভূমি বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, কাজেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার একটি অংশের, বিশেষ করিয়া খেবা বিল অঞ্চলের জল একটি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বিলের দ্বারা বাহির হইয়া খড়দহের নিকটে হুগলী নদীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ খালটি এবং বারিতি বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নয়ি খালের সংস্কার একান্ত আবশ্যক। ইহার ফলে একমাত্র এই থানায় আরও ১০ বর্গ মাইল জমিতে খাদ্য শস্যের উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। কলিকাতার সান্নিধ্যের জন্যই দমদম থানার প্রাধান্য এত অধিক। শিল্প-প্রধান অঞ্চলের যে দুইটি থানা গঙ্গার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত না হওয়ায় উপযুক্ত কলকারখানা স্থাপনের জমি সরবরাহ করিতে পারে নাই, ইহা তাহাদের মধ্যে একটি। এই থানার অধিকাংশ স্থানই নীচু বলিয়া বন্যার জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়; ইহা রোধ করিতে পারিলে বর্তমান থানার অন্তত অর্ধাংশ পুনরায় শস্য শ্যামলা হইয়া উঠিবে।

কলিকাতার দক্ষিণে দুই স্থানে জলাভূমি আছে। টালীগঞ্জের পূর্বদিকে এক বিশাল জলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা জলারই এক অংশ। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। চড়াইল খালের দক্ষিণে বজবজ থানার বহুলাংশ বর্ষার সময় জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এখানে সর্বপ্রথম বাইতা জলার জল

নিঃসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বজবজ থানার দক্ষিণে কতকগুলি শুষ্ক খাল দেখা যায়—ইহাদের মধ্যে একটির সহিত অন্যটির কোন যোগাযোগ বর্তমানে নাই। এক সময়ে ইহারা প্রবহমান ছিল। ইহাদিগকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

উত্তর হুগলীতটের বিভিন্ন অংশে কোথায় কি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য স্থানীয় চাহিদা কতটা মিটাইতে পারে তাহা এইবার আলোচনা করা যাক। উত্তরের দুইটি থানা, নৈহাটি ও জগদ্দল, এবং দক্ষিণের তিনটি থানা, বেহালা, মহেশপুর এবং বজবজের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমিতে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে অনাবাদী জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। টিটাগড় এবং খড়দহে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জমিতে চাষ হইয়া থাকে। হুগলীতটের অবশিষ্টাংশে চাষের জমির পরিমাণ খুবই কম। উত্তরে নপাড়া ও ব্যারাকপুর, এবং দক্ষিণে টালীগঞ্জ অঞ্চলে চাষের জমি নাই বলিলেই চলে। সাধারণত নদীতট সন্নিহিত ছোট ছোট থানাগুলিতে প্রায় সবটাই হয় কলকারখানা, আর না হয় বড়লোকের বাগানবাড়ী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ফলে চাষের জন্য একটুও জমি অবশিষ্ট থাকে না।

জগদ্দল প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর কর্ষণযোগ্য অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে, সেই সেই থানাতেই ১৯৩১-৪১ সালে জনসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু বেহালা, বজবজ ও মহেশতলা অঞ্চলে উক্ত প্রকারের

জমির পরিমাণ কম থাকার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় নাই। ব্যারাকপুরে অব্যবহার্য জমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক, সমগ্র থানায় প্রায় অর্ধেকেরও বেশী; এবং নপাড়া, বরানগর, টালীগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের কাছাকাছি। উপরোক্ত প্রত্যেক থানাই শিল্প প্রধান এবং ঘন বসতিপূর্ণ। টালীগঞ্জে জলাভূমির আধিক্যের জন্য ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়।

জেলার অধিকাংশ স্থানে দো-ফসলী জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। কেবলমাত্র বজবজ থানার গ্রামাঞ্চলে আবাদী জমির এক পঞ্চমাংশে একাধিক শস্য উৎপন্ন হয়।

উৎপন্ন শস্যগুলির মধ্যে আমনই প্রধান, দক্ষিণ অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতেই এই শস্যের চাষ করা হয়। কলিকাতার উত্তরে দমদম এবং টিটাগড় থানায় সর্বাধিক পরিমাণে আমন ধানের চাষ করা হয়। ফলমূল ও শাকসব্জীর চাষেও এই অঞ্চলে চাষীদের যথেষ্ট লাভ হয়। ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানে ফল এবং শাকসব্জী ছাড়া আর বিশেষ কিছুই উৎপাদন করা হয় না। নপাড়া, বরানগর এবং টালীগঞ্জ, এই তিনটি থানার কৃষিভূমির অর্ধাংশেই ফল এবং শাকসব্জী লাগান হয়। আলু, পেঁয়াজ বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি বিলাতী বেগুন প্রভৃতি বহুবিধ সব্জী এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তে আউসের চাষ হয়। পাট ও অন্যান্য শস্যাদি অল্পাধিক পরিমাণে জন্মায়। দক্ষিণ অঞ্চলে মাথাপিছু ধান্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু স্থানীয়

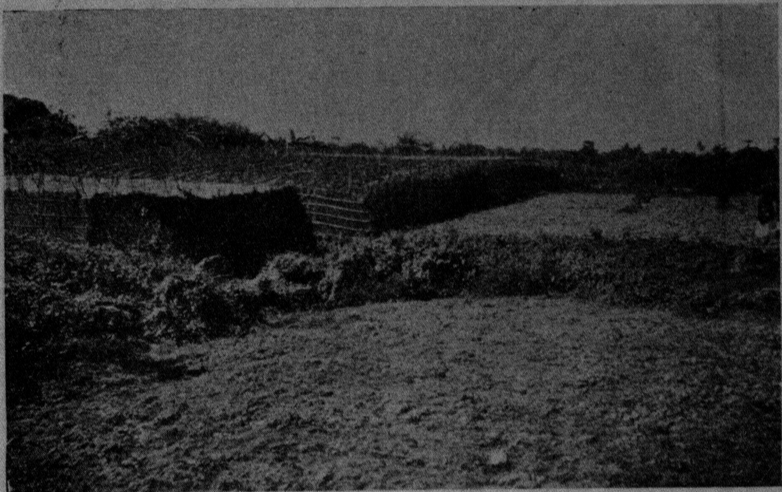
চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। উত্তরের থানাগুলিকে চাল সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া ধরা হয়। ফল এবং শাকসব্জীর দিক হইতে এই অঞ্চল বাংলার কৃষি সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; অবশ্য আলুকে ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। অন্যান্য শস্যের মাথা পিছু উৎপাদনও অত্যন্ত কম।

মাছ ধরা এই অঞ্চলের কৃষকদের অন্যতম পেশা। কলিকাতার বাদা-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হইয়া থাকে।

গৃহপালিত পশু, লাঙ্গল, গরুরগাড়ী ও নৌকা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গবাদি পশুর সংখ্যা কোথাও প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ শতের অধিক নহে। কেবলমাত্র বরানগরে কিঞ্চিদধিক ৭০০ শত দেখা যায়। উত্তরে ব্যারাক-পুরে ও মহেশতলায়, এবং দক্ষিণে টালীগঞ্জে ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। প্রায় থানাগুলিতেই, বিশেষ করিয়া উত্তর অঞ্চলে ছাগল এবং ভেড়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম। টালীগঞ্জ, বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে যদিও ইহাদের সংখ্যা সর্বাধিক, তথাপি প্রতি হাজার লোকপিছু ৫০এর ঊর্ধ্বে উঠে না। ছাগল এবং ভেড়ার সংখ্যা উত্তর অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা কম। নৌকা ও গরুর গাড়ীর সংখ্যাও অল্প।

(২) আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর সমভূমি

২৪ পরগণার উত্তর সীমানার নিকটবর্তী অঞ্চলটিই যে আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর সমভূমি নামে পরিচিত, এ কথা পূর্বেই



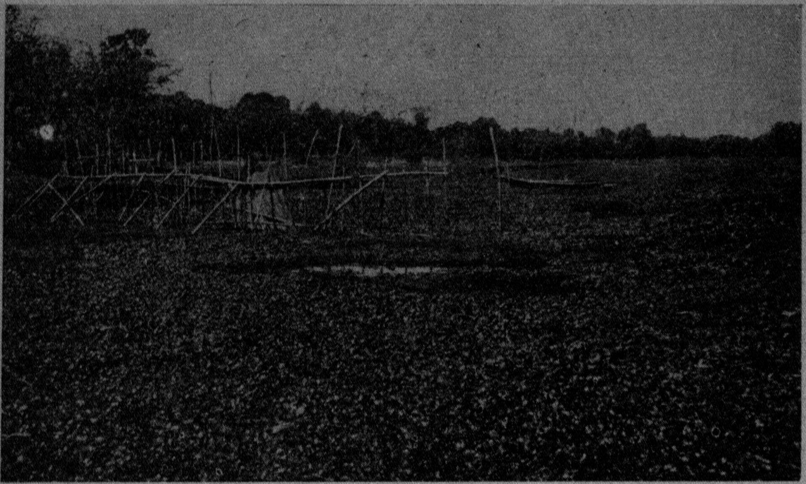
ফটোচিত্র ২৯—গ্রামাঞ্চলে পানের বরোজ

[রৌদ্রের তেজে পানের কোমল লতানো গাছগুলি যাহাতে মরিয়া না যায় সেইজন্য এইরূপ ছাওয়া ঘরের প্রয়োজন। (পৃষ্ঠা ১০০)]



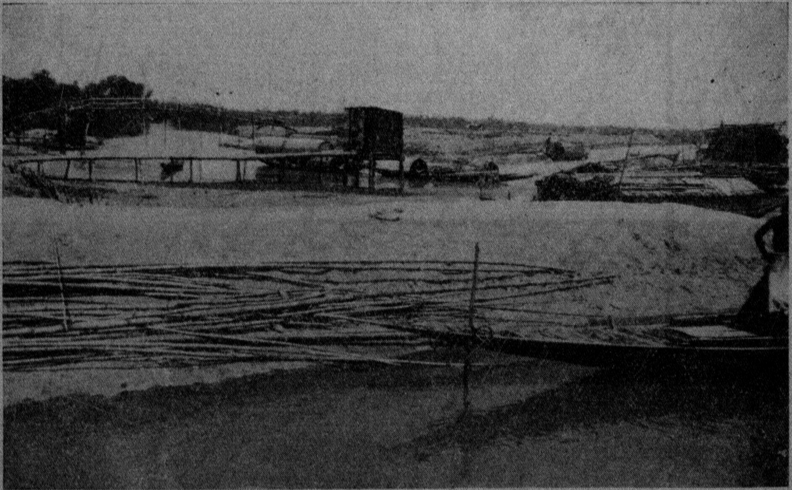
ফটোচিত্র ৩০—কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে ফলের বাগান

[কলিকাতার দক্ষিণে বারুইপুর অঞ্চলে একটি লিচু বাগান দেখা যাইতেছে। কলমের গাছগুলি উঁচুতে না বাড়িয়া পাশে ঝোপের মত বাড়িতে থাকে। (পৃষ্ঠা ৮৮, ১০০)]



ফটোচিত্র ৩১—কচুরীপানায় ঢাকা মজা যমুনা নদী

[যমুনা কচুরীপানায় ভরিয়া গিয়াছে ; নদীর মাঝখানে মাত্র অল্প একটু জায়গায় নদীর নিশ্চল জল চিক্‌চিক্ করিতেছে। নদী গর্ভে বাঁশের বেড়া দিয়া মাছ ধরা হয়। (পৃষ্ঠা ১১, ৯০, ৯১)]



ফটোচিত্র ৩২—ইছামতীর আঁকা বাঁকা খাত

[নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে চিত্রে দেখা যাইতেছে। নদীর প্রধান খাতটির উপর মাল বোঝাই কয়েকটি নৌকা দেখা যাইতেছে। ছবির বাম দিকে নদীর একটি প্রাচীন খাতের উপর বাঁশের পুল রহিয়াছে। (পৃষ্ঠা ৯১)]

বলা হইয়াছে (মানচিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২৫০ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। ইহার অধিকাংশ ভূ-ভাগ তিনটি থানার অন্তর্গত—আমডাঙ্গা, হাবড়া ও স্বরূপনগর। আমডাঙ্গা ও হাবড়ায় উল্লেখযোগ্য কোন নদী নাই। ইহার পূর্ব সীমানায় সুঁতীনদীর কয়েকটি ছিন্নভিন্ন অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। মণ্ডলপাড়া হইতে নপাড়া পর্যন্ত সুঁতীর কোন চিহ্নই নাই। ডাঙ্গাজমির আধিক্যের জন্যই এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশের নাম রাখা হইয়াছে আমডাঙ্গা বা সুঁতীডেঙ্গা। জলাভাবে এখানে ভাল কৃষিকার্য হয় না। পূর্বে বহু দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করিয়া এখানকার কৃষিজমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইত। সংস্কারাভাবে এখন উহাদের অধিকাংশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মাত্র জিরাট, ধনিয়া, অনখা, মরিচা, হরপুর ও দাদপুর—এই ছয়টি গ্রামের দীঘিগুলি এখনও বিদ্যমান। এ ছাড়া নওয়াই খাল মাত্র চারুহাট, তাবাবেরিয়া ও সাহাপুর এই তিনটি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমডাঙ্গায় বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে; ইহাদের মধ্যে আমডাঙ্গা, বোদাই, বেরাবেরিয়া জিরাট, অধাতা, দরিয়াপুর ও ধনিয়া উল্লেখযোগ্য। **আমডাঙ্গা** ও **জিরাটে** বিভিন্ন দিক হইতে কয়েকটি রাস্তা আসিয়া মিলিত হওয়ায় এই দুইটি গ্রাম ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। অন্যত্র, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে যাতায়াতের কোন ভাল পথ নাই; ফলে এখানকার প্রায় ৮০টি গ্রামের সহিত বাহির জগতের সংযোগ খুবই কম। জলসেচের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং নূতন নূতন

রাস্তাঘাট নির্মাণের উপর আমডাঙ্গা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করিতেছে।

আমডাঙ্গার পূর্বদিকে কিঞ্চিদধিক ১০০ বর্গমাইল সমভূমি অঞ্চল হাবড়া থানার অন্তর্গত। ইহারই মধ্য দিয়া শীর্ণকায়া পদ্মানদী প্রবাহিত; বর্ষাকালে পদ্মার জল চারিদিকে ছড়াইয়া বহু জলার সৃষ্টি করে বলিয়া এই অঞ্চলের নাম রাখা হইয়াছে পদ্মার বেনো জমি। মাণিকনগর গ্রামের কাছে পদ্মার একটি বাঁক এখনও বিদ্যমান। এই বাঁকের উত্তরে ও দক্ষিণে মাত্র কিছুদূর পর্যন্ত গ্রীষ্মকালেও এই নদীতে অল্প জল থাকে, তবে বহুস্থানে নদীতে জল না থাকায় নদীগর্ভে চাষবাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বদিকে বামনডাঙ্গা গ্রামে পদ্মাকে আবার দক্ষিণ হইতে আসিতে দেখা যায়। পরে এই নদীটি আরও ৫ খানি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চারঘাট গ্রামের পূর্ব প্রান্তে যমুনার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পদ্মার তীরে অবস্থিত গ্রামগুলির পূর্ব গৌরব আজ লুপ্ত হইয়াছে। পদ্মার প্রায় দুই মাইল পশ্চিমদিকে বিদ্যাধরীর কয়েকটি মাথা বিভিন্ন দিক হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে, বসিরহাটি, রাউতারা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-মুখে অগ্রসর হইয়াছে।

সুঁতী, বিদ্যাধরী ও পদ্মা—এই তিনটি নদীর অবস্থা আজ শোচনীয়; ইহাদের সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক। যমুনা নদীর অবস্থাও তদ্রূপ; এই নদীটির মাত্র ১২ মাইল গতিপথ

এই অঞ্চলের উত্তর পূর্ব সীমানার কাছে অবস্থিত। ইহার গতি এতই মন্থর যে, নদী প্রবাহিত হইতেছে কিনা, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। মনে হয় নদীর জল বিলের জলের মত নিশ্চল হইয়া আছে। নদীগর্ভের স্থানে স্থানে বাঁশ পুতিয়া নদীটিকে ভাগাভাগি করিয়া মাছ ধরা হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূবে যমুনা, দিয়াড়া গ্রামে ইছামতীর সহিত আসিয়া মিলিত হইত, এবং ঐ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখনও এক বিরাট মেলা বসে। বর্তমানে এই নদী দুইটির সঙ্গমস্থল পূর্বদিকে কয়েক মাইল সরিয়া গিয়াছে। ইছামতীই একমাত্র জীবন্ত নদী, যদিও ইহা আঁকিয়া বাঁকিয়া অনবরত পথ পরিবর্তন করিতেছে এবং ইহার প্রাচীন অংশগুলি বাঁওর বা দহে পরিণত হইতেছে। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে ঐ সকল দহ, বিশেষ করিয়া, ইছামতীর পূর্ব দিকে অবস্থিত বিশাল বল্লীবিল হইতে প্রচুর মৎস্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর সমভূমির মধ্যভাগে একটি প্রশস্ত রাস্তা ও খুলনাগামী রেলপথ থাকায় আশপাশের গ্রামের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ আছে। এই রেললাইনের ধারে অবস্থিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলির মধ্যে গোবরডাঙ্গা, মসলন্দপুর ও হাবড়া প্রধান। গোবরডাঙ্গা প্রাচীন কুশদ্বীপ বা কুশদহের অন্তর্গত। যমুনা নদী মজিয়া যাওয়ায় ইহার পূর্ব গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সহরের জনসংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। মসলন্দপুর একটি ব্যবসা কেন্দ্র। এখান হইতে মোটরবাস বিভিন্ন দিকে নিয়মিতভাবে যাতায়াত

করে। সুঁতী নদীর তীরে অবস্থিত মটিয়াগাছা অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র। ভুরকুণ্ডা, বাইগাছি, ও মথুরাপুর উল্লেখযোগ্য গ্রাম।

আমডাঙ্গা-স্বরূপনগরের পশ্চিমাঞ্চলের মত পূর্বাঞ্চলেও ভাল রাস্তা বা রেলপথ নাই। তবে নদীগুলির অবস্থা ভাল থাকায় জলপথে এই অংশের প্রায় সর্বত্র যাওয়া যায়। ইছামতীর তীরে অবস্থিত স্বরূপনগর এখানকার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বল্লীবিলের দক্ষিণে গোকুলপুর ও বড় বাঁকড়া, পশ্চিমে বাংলানি ও সাড়াপুল, এবং উত্তরে ঝিরী প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী গ্রামে বহু লোকের বাস।

এই অঞ্চলের কোথাও সমগ্র জমির শতকরা ৮০ ভাগের বেশী অংশে চাষ আবাদ হয় না। পূর্ব এবং পশ্চিম ধারে আবাদী জমির পরিমাণ মধ্যভাগ অপেক্ষা অধিক। হুগলী তীরে আবাদী জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা যত, এখানে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। কর্ষণযোগ্য অনাবাদী ভূমির পরিমাণ শতকরা ৯ হইতে ১২র মধ্যে; মধ্য ভাগে সর্বাপেক্ষা বেশী, এবং পূর্বভাগে সর্বাপেক্ষা কম। অনাবাদী ভূমির পরিমাণও মধ্যভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক। আবাদী জমির একপঞ্চমাংশে, বিশেষত ইছামতীর দুই তীরে একাধিক শস্যের চাষ হয়। অন্যত্র দো-ফসলী জমির পরিমাণ খুবই কম। এই অঞ্চলের উৎপন্ন শস্যের মধ্যে যদিও আমন চাষের জমি সর্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ইহার চাষ সর্বত্র দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টি, বেলে মাটি, নদীনালার মজিয়া যাওয়া প্রভৃতি কারণে আমন ধানের চাষ কমিয়া

আউসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যভাগে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে আউস চাষ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলেই ২৪পরগণার মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। স্বরূপ-নগর প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে কিছু পরিমাণ ডাল উৎপন্ন হয়। মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে উৎপন্ন চাল স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা ত' মিটাইতে পারেই, উপরন্তু অন্যত্র রপ্তানি হইবার জন্য বহু গোলায় সঞ্চিত থাকে। উৎপন্ন সমস্ত পাট অতি সহজেই কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়, যদিও এখানে ইছামতীর তীরে চটকল স্থাপন করিবার কিছু কিছু সুবিধা রহিয়াছে। এই অঞ্চল অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের দিক হইতে নিজের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ নয়।

গৃহপালিত পশু, লাঙ্গল, গরুরগাড়ী নৌকা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জেলার পূর্বাংশে গবাদি পশুর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অন্যান্য অঞ্চলেও প্রতি বর্গ মাইলে চারি শতের অধিক হইবে না। প্রতি বর্গ মাইলে ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যাও এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কম। এই অঞ্চলের মধ্যভাগে গরুর গাড়ীর সংখ্যা অত্যধিক, যদিও নৌকার সংখ্যা খুব বেশী নহে।

(৩) বারাসাত-বসিরহাট সমভূমি

জেলার উত্তরাংশের সর্বাপেক্ষা উর্বর কৃষিভূমি, বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলেই দেখা যায়। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায়

৪০০ বর্গ মাইল, এবং ইহার অধিকাংশ ভূভাগ চারিটি থানার অন্তর্গত—বসিরহাট, বাদুরিয়া, দেগঙ্গা ও বারাসাত। বিদ্যাধরী (বাতাগাছি গাং) এবং ইছামতীর মধ্যবর্তী বসিরহাট থানার অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সর্বত্র জল নিঃসারণের সুবন্দোবস্ত আছে। কেবলমাত্র সিঙ্গা নদী পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

উত্তর-পূর্ব অংশের পূর্বভাগে দক্ষিণ-প্রবাহিণী ইছামতী এবং পশ্চিমভাগে উত্তর-প্রবাহিণী পদ্মা বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত বড় বড় গ্রামকে ঘিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সমভূমির মধ্যভাগে দেগঙ্গা থানায় জল নিঃসারণের সেরূপ কোন সুবন্দোবস্ত নাই। দেগঙ্গা বিলটি দেখিলে মনে হয় যেন ইহা এক সময় কোন এক নদীর অংশ বিশেষ ছিল। অসংখ্য ছোট ছোট এই ধরণের হ্রদ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পশ্চিম সীমানার কাছে প্রবাহিত বিদ্যাধরী নদীতে জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রবেশ করে বলিয়া এই অংশে ইহাকে নোনা গাং বলা হয়। এই অঞ্চলের পশ্চিম অংশ বারাসাত থানার অন্তর্গত। বারাসাত থানার উত্তরার্ধে বর্ষার জল প্রধানত সুঁতী নদী দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং দুই পার্শ্বের জমিকে অত্যন্ত উর্বরা করিয়া রাখিয়াছে। বারাসাতের দক্ষিণাংশে বহু জলাভূমি দেখা যায়। এই জলাভূমি অঞ্চলের কতক জল সুঁতী এবং কতক হারুয়া গাংয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। এই বিলগুলিতে এবং সন্নিহিত ভূ-ভাগের কতকাংশে মাছের চাষ হইয়া থাকে।

মাছ ধরিবার সুবিধার জন্য সমগ্র অঞ্চলটিকে মাটির বাঁধ দিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইগুলিকে ভেরী বলা হয়। জোয়ারের সময় বিভিন্ন জাতীয় মাছ লবণাক্ত জলের সহিত ভেরীগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু ভাঁটার সময় যখন জল কমিতে থাকে, তখন ইহারা যাইতে পারে না, এবং অতি সহজে ধরা পরে।

মাছ ধরার এই বাঁধগুলি যে দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃষ্টির জল বাঁধের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ধান ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারে না, আবার জোয়ারের সময় নদীর নোনা জল মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহজেই জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। কৃষিকার্যই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র পেশা, যদিও ইহাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই জমির মালিক। যখন চাষের কাজ না থাকে তখন এই অঞ্চলের কৃষকেরা গুড় প্রস্তত প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকে। এই অঞ্চলে বেলে অনুর্বর-জমিতে খেজুর গাছেরও চাষ হয়।

এই বুনো খেজুর গাছের ফল সুস্বাদু নহে বটে, কিন্তু রস হইতে সুস্বাদু খেজুরের গুড় তৈয়ারী হয়। আমন ধান্য কাটিবার কিছু পরেই খেজুর গাছের ডগার একটু নীচে গা ফুটা করিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। এই খেজুর রসকে বড় পাত্রে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তত করা হয়। খেজুরের গুড় আকের গুড় অপেক্ষা অনেক সুস্বাদু। বর্তমানে এই শিল্পটির বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই, যদিও খেজুর

রস হইতে সাদা চিনি প্রস্তুত করা সহজসাধ্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেজুরগাছ চাষের চেষ্টা কোথাও কোথাও হইতেছে।

এই অঞ্চলের পূর্ব-দক্ষিণাংশে মানুষের বসতি সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানে ইছামতীর দক্ষিণ তীরেই প্রধানত গ্রামগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই অঞ্চলের বৃহত্তম নগর **বসিরহাটের** লোকসংখ্যা ২৬ হাজারের উপর। ইহা জেলার চাউল সরবরাহের একটি প্রধান কেন্দ্র, এবং ক্রমেই ইহার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮১ সাল হইতে এই সহরের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি এই সহরে একটি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। ইছামতীর তীরে অবস্থিত **বাদুরিয়া** এই অঞ্চলের দ্বিতীয় সহর। এই সহরটি একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র, যদিও ১৮৮১ সাল হইতে ইহার লোক সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। **টাকী** সহর হাস্‌নাবাদ থানার অন্তর্গত হইলেও বারাসাত-বসিরহাট সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তেই অবস্থিত। ইহা ইছামতীর একটি বাঁকের মুখে অবস্থিত। নদীর স্রোতে তীরের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সাল হইতে এই সহর দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সহরের পুকুরগুলি কচুরী পানায় ভর্তি হইয়া গিয়াছে।

এই অঞ্চলের মধ্যভাগে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। **দেগঙ্গা** একমাত্র জনবহুল গ্রাম। ইহার সন্নিকটে বাংলার একটি পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দেগঙ্গার



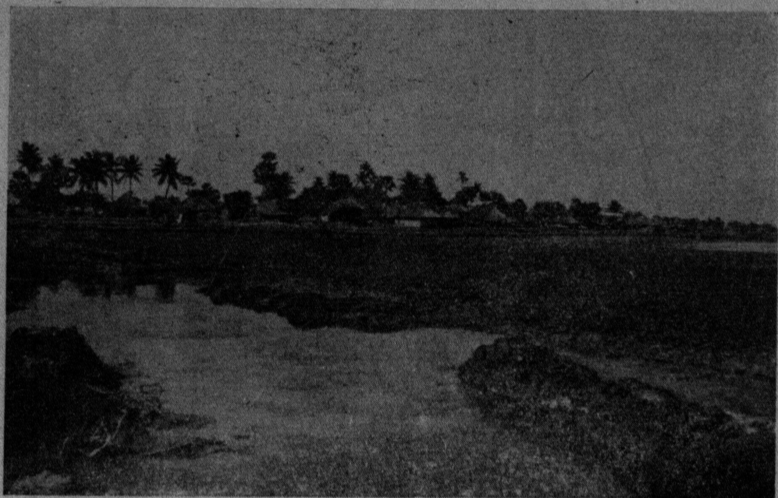
ফটোচিত্র ৩৩—বসিরহাট—চাল রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র

[বসিরহাট যে চাল রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র তাহা ষ্টেশনেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। চিত্রে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর রপ্তানির জন্য বহু চালের বস্তা দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ৯৬)]



ফটোচিত্র ৩৪—টাকী—কচুরীপানায় ঢাকা একটি পুকুর

[পূর্ব সীমান্তবর্তী শহরগুলির মধ্যে টাকী সবচেয়ে বড়। শহরে বহু বাঁধান সুন্দর সুন্দর পুষ্করিণী আছে। (পৃষ্ঠা ৯৬)]



ফটোচিত্র ৩৫—কলিকাতার পূর্বদিকে এক জলাভূমির দৃশ্য

[কলিকাতার পূর্ব দিকে একটি জলাভূমি দেখা যাইতেছে। দূরে **বাদাগ্রাম** এবং ছবির আরও ডানদিকে **ভুবনপুরের** জলার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (পৃষ্ঠা ৭, ১০, ১০৫)]



ফটোচিত্র ৩৬—হারোয়া গাঙের তীরে জেলে পল্লী

[ভাঙ্গর কাটাখালের জল হারোয়া গাঙে আসিয়া পড়ে। চিত্রে হারোয়া গাঙের তীরে **বাকডোবা** গ্রাম দেখা যাইতেছে। নদীতে ভাঁটার জন্য জেলে ডিঙিটি এঁটেল মাটিতে আটকাইয়া গিয়াছে। (পৃষ্ঠা ১৪, ১০৫)]

পশ্চিমে অবস্থিত সমভূমিতে অধিকতর ঘনবসতি; প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় এক হাজার লোকের বাস। এখানে সুঁতীনদীর তীরে অথবা কোন বড় রাস্তা বা খালের ধারেই গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিতেছে। **বারাসাত** একটি বাণিজ্য প্রধান সহর; কয়েকটি পাকা রাস্তা ও দুইটি রেলপথ এই সহরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অনুকূল অবস্থান থাকা সত্বেও ১৮৮১ সাল হইতে এই সহরের জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। বারাসাতের দক্ষিণে মধ্যমগ্রাম অপর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। **দত্তপুকুর** দুগ্ধজাত দ্রব্য—ছানা, ক্ষীর প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত; এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রত্যহ কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে।

আবাদী ভূমির অনুপাতে প্রতি বর্গমাইলে জন সংখ্যার বসতি বসিরহাট থানায় সর্বাপেক্ষা অধিক, ও দেগঙ্গা থানায় সর্বাপেক্ষা কম। এই অঞ্চলের চারিটি থানায় শতকরা ৭০ ভাগের বেশী জমিতে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। এরূপ চাষের জমির পরিমাণ পশ্চিম অংশ হইতে পূর্বাংশেই অধিক। উত্তর-পূর্ব অংশে আবাদী জমির প্রায় এক তৃতীয়াংশে একাধিক শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অংশের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ জমিতে একাধিক বার ফসল জন্মায়। পশ্চিমদিকে দো-ফসলি জমির পরিমাণ কমিয়া শতকরা মাত্র ৮ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

এই অঞ্চলে এমন কম জমিই আছে, যাহাতে কোন প্রকার চাষ আবাদ করা সম্ভবপর নহে। পশ্চিম অংশে চাষের

অযোগ্য জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক, এবং পূর্বাংশে চাষের যোগ্য কিন্তু অনাবাদী জমি কিছু কিছু দেখা যায়। জেলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানকার অধিকাংশ জমিতেই আমন ধানের চাষ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমডাঙ্গা, স্বরূপনগর অঞ্চলের ন্যায় বাদুরিয়া, দেগঙ্গা অঞ্চলেও যথেষ্ট আউস জমি, সমগ্র চাষের জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ, দেখা যায়।

বাদুরিয়ার অপর চতুর্থাংশে ডাল ও অন্যান্য শস্য, এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। একমাত্র এই অঞ্চলেই বহুল পরিমাণে একাধিক শস্যের চাষ হইয়া থাকে। বাদুরিয়া অঞ্চলে আমন ধানের চাষ অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কম, কিন্তু এখানে যাহা জন্মে তাহা স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। বসিরহাট অঞ্চলে আমন ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা অধিক, মাথা-পিছু ৬ মণের উপর চাল উৎপন্ন হয়। কাজেই, এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল রপ্তানি হইয়া থাকে। বারাসাতেও রপ্তানি করিবার মত অতিরিক্ত চাল আছে। পূর্বদিকে অবস্থিত বসিরহাটে ও বাদুরিয়ায়, এবং পশ্চিমে অবস্থিত বারাসাতে মাথাপিছু এক মণের অধিক পাট উৎপন্ন হয়।

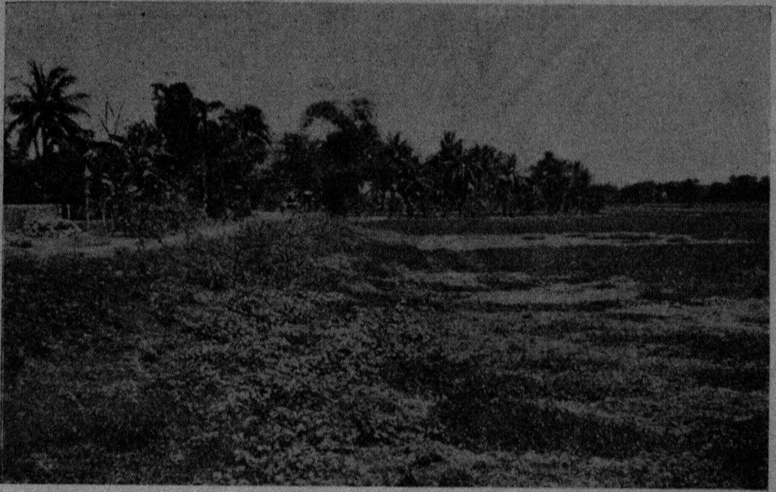
গবাদি পশুর সংখ্যা পশ্চিমাংশ হইতে পূর্বাংশে অপেক্ষাকৃত কম। বসিরহাটে অবশ্য ছাগল এবং ভেড়ার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এইখানেই লাঙ্গল, গরুর গাড়ী ও নৌকার সংখ্যাও সবচেয়ে বেশী।

(৪) দক্ষিণ সমভূমি

২৪ পরগণা জেলার মধ্যে দক্ষিণ সমভূমিই সর্বাপেক্ষা উর্বর এবং ঘন বসতি পূর্ণ কৃষি অঞ্চল। ইহার আয়তন প্রায় ৬০০ বর্গমাইল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূভাগ আটটি থানার অন্তর্ভুক্ত—সোনারপুর, প্রতাপনগর, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, মগরাহাট, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপী। এই স্থানটি সম্পূর্ণরূপে একটি উচ্চ বাঁধের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কাজেই সুন্দরবনের নদীগুলির লবণাক্ত জল এই অঞ্চলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই সমভূমির বন্ধুরতা এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। গ্রামগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট, এবং প্রত্যেক গ্রামে মাটির দেয়াল ঘেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বহু কুটীর দেখা যায়। গ্রামের সন্নিকটে খেজুর, সুপারী, তেঁতুল প্রভৃতি গাছ এবং বাঁশঝাড় এক বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তাল জাতীয় গাছগুলির মধ্যে খেজুর ও তালেরই আধিক্য দেখা যায়, এবং ইহা হইতেও যথেষ্ট অর্থাগম হয়। এই গাছগুলি সর্বত্রই জন্মিতে পারে, যদিও জলাভূমি অঞ্চলই তাহাদের বেশী প্রিয়।

বারুইপুর-জয়নগর সমভূমি গঙ্গার পলিমাটি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অঞ্চলে খাদ্য-শস্য অপেক্ষা ফলমূল, শাকসব্জী ও পান প্রভৃতির চাষই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে এই সমস্ত জিনিষের চাহিদা খুব বেশী ; এখানকার রাস্তা-ঘাটের অবস্থা ভাল বলিয়া বারুইপুর, জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর হইতে

ফলমূল দ্রুত ট্রাকের সাহায্যে কলিকাতার বাজারে চালান দেওয়া হয়। বারুইদের বাস বলিয়া বারুইপুর শহরের নামকরণ করা হইয়াছে। এখানে বহু পানের বরোজ দেখা যায়। পানের চারাগুলি রৌদ্রের তেজ সহ্য করিতে পারে না, কাজেই বরোজের মধ্যে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। বারুইপুর সুমিষ্ট লিচুর জন্য বিখ্যাত। দো-আঁশলা মাটিতে লিচু ভাল জন্মায়। এই অঞ্চলে গঙ্গার পুরাতন খাতের মধ্যে জমি চাষ করিয়া ধান উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। আমন ধান ছাড়া অন্যান্য শস্য চাষ করিতে হইলে নদীগর্ভকে অন্ততঃ ৪ ফুট উচ্চ করা প্রয়োজন, তাহা না হইলে বর্ষার জলে জমি ডুবিয়া যায়। জয়নগর হইতে বিষ্ণুপুর যাইবার পথে পুরাতন গঙ্গাগর্ভ সহজেই চেনা যায়। ইহার এক তীর দিয়া রেললাইন গিয়াছে, এবং অপর তীরে পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। নদীগর্ভের অধিকাংশ স্থানই এখনও পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা হয় নাই। বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় বলিয়া বহু উর্বর জমিকে কাজে লাগাইতে পারা যায় নাই। মজা নদীর তীরে ভাল মাটির প্রাচুর্যের জন্য বহু ইটখোলা স্থাপিত হইয়াছে। শুষ্ক নদীগর্ভে বহু পুষ্করিণী সহজে খনন করিয়া পানীয় জলের অভাব মোচন করা হইয়াছে। এই পুষ্করিণীগুলিকে গঙ্গার সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং ইহারা ঘোষেদের গঙ্গা, বোসেদের গঙ্গা নামে পরিচিত। বারুইপুর-জয়নগর সমভূমির পশ্চিম দিকে কতকগুলি খাল থাকায় বৃষ্টির জল সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে, এবং ফলে কৃষিকার্যের সুবিধা



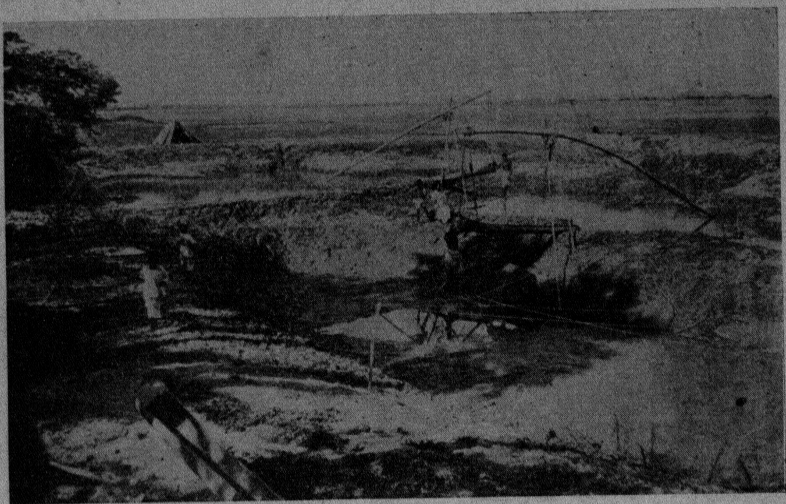
ফটোচিত্র ৩৭—দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে গঙ্গার প্রাচীন খাত

[বিষ্ণুপুর যাইবার পথে গঙ্গার প্রাচীন শুষ্ক খাত চিত্রে দেখা যাইতেছে। ছবির বাঁ দিকে গঙ্গার প্রাচীন তীর দিয়া এখন একটি রাস্তা এবং দূরে ডান দিকে অপর তীর দিয়া রেল লাইন চলিয়াছে। (পৃষ্ঠা ১০০ ও মানচিত্র ২)]



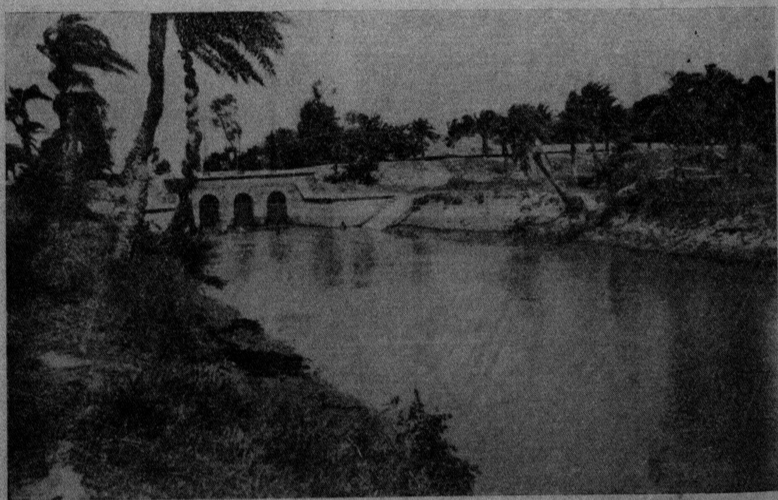
ফটোচিত্র ৩৮—বিষ্ণুপুরের নিকট গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে পুষ্করিণী খনন

[স্থানীয় লোকেরা এইরূপ পুষ্করিণীর জলকে গঙ্গার জলের মত পবিত্র মনে করেন। গঙ্গার তীরের মতই পুষ্করিণীর তীরে শবদাহ করা হইয়া থাকে। (পৃষ্ঠা ১০০)]



ফটোচিত্র ৩৯—কর্দমাক্ত জলে কই মাগুর সিঙি প্রভৃতি মাছ ধরা

[কাদার মধ্য হইতে কই, মাগুর, সিঙি প্রভৃতি মাছ ধরিবার জন্য জলাভূমি অঞ্চলে জল ছেচিয়া ফেলা হইতেছে, চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১০১)]



ফটোচিত্র ৪০—দক্ষিণ সমভূমির মধ্যদিয়া প্রবাহিত কুলপী খাল

[২৪ পরগণার একটি কৃষি প্রধান অঞ্চলের মধ্য দিয়া কুলপীখাল খনন করা হইয়াছে। চিত্রে কুলপীখালের প্রধান স্লুইস্ গেট দেখা যাইতেছে; গেটের অপর পারে গঙ্গা। গেটের নিকট কয়েকজন ধীবর রমণী পলুইএর সাহায্যে মাছ ধরিতেছে। (পৃষ্ঠা ১০১)]

হয়। যেখানে উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা নাই, সেখানে বহু পুষ্করিণী খনন করিয়া মাছ ধরার কার্যে ব্যবহৃত হয়। রুই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি যে সমস্ত মাছ বদ্ধ কর্দমাক্ত জল পছন্দ করে, সেরূপ মাছই এই সকল পুষ্করিণীতে ধরা হয়। লম্বা বাঁশের গায়ে ঝোলান বালতির সাহায্যে পুকুরের জল ছেচিয়া ফেলিয়া হাত দিয়া মাছ ধরা হয়। কুলপী খাল দক্ষিণাংশের ধান জমির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া কৃষিকার্যের পক্ষে অনুকূল। এই খালের তীরে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মায়। গঙ্গা এবং কুলপী খালের সঙ্গমের দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার।

এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে এক হাজারের কিছু বেশী। তবে ইহা অপেক্ষা কোথাও কিছু বেশী আর কোথাও কিছু কম যে দেখা যায় না, তাহা নহে। দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত কুলপী সমভূমিতে, বিশেষত দক্ষিণাংশে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। মধ্য অংশে লোকেরা ইতস্তত ছড়াইয়া বাস করে। অন্যান্য অঞ্চলে গ্রামগুলিকে নদীর বা রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে দেখা যায়। মজা গঙ্গার দুই তীরে বহু বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম অবস্থিত। এই অঞ্চলে বহু রেল, রাস্তা ও খাল থাকায় মানুষের চলাচলের এবং জিনিষপত্র আমদানী ও রপ্তানি করার কোন অসুবিধা নাই। ফলে পতিত জমি একান্ত বিরল, এবং গ্রামগুলি ধনধান্যে ভরা। **জয়নগর-মজিলপুর** এই অঞ্চলের বৃহত্তম সহর। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে ইহার জনসংখ্যা ধীরে ধীরে, এবং তাহার পর হইতে দ্রুত

বৃদ্ধি পাইয়াছে। জয়নগরে বহু সুন্দর সুন্দর দেবালয় শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বারুইপুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। বহুদিন পর্যন্ত এই শহরটি বাড়িবার সুযোগ পায় নাই। মগরাহাট একটি চাউল রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র; চাউল চালান দিবার সুবিধার জন্য একটি খাল কাটিয়া মগরাহাট ষ্টেশনের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

প্রায় সর্বত্র সমগ্র জমির শতকরা ৬১ হইতে ৮৩ ভাগ আবাদী জমি। মধ্যভাগে অর্থাৎ বিষ্ণুপুর হইতে কুলপী পর্যন্ত ভূভাগে এরূপ আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর। অধিকাংশ স্থানে কাহারও দুই একরের বেশী জমির জোত নাই। উত্তর-পূর্ব অংশে অর্থাৎ সোনারপুরে কর্ষণ-যোগ্য পতিত ভূমির পরিমাণ সর্বাধিক; বিষ্ণুপুর, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে এই ধরণের অব্যবহৃত জমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। কর্ষণের অযোগ্য ভূমির পরিমাণ কোথাও শতকরা ২০ ভাগের অধিক নহে।

দক্ষিণ সমভূমির শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। মাত্র সোনারপুর ও বারুইপুরে ফল ও শাকসব্জী অধিক পরিমাণে জন্মায়, কাজেই আমন ধানের জমি শতকরা ৮০ ভাগের উপরে উঠে না। অন্যান্য শস্য প্রধানত গৃহে ব্যবহারের জন্যই উৎপন্ন করা হয়। মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইতে বুঝা যায় যে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানিযোগ্য আমন ধান আছে। এখানকার কৃষকদের অধিকাংশই অবস্থাপন্ন; কাজেই এখানে

যথেষ্ট সংখ্যায় ছাগল, ভেড়া গরুরগাড়ী ও নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) প্রাচীন সুন্দরবন

এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল এবং অধিকাংশ ভূভাগ চারিটি থানার অন্তর্গত—হাসনাবাদ, হারোয়া, ভাঙ্গর ও রাজারহাট। টাকীর দক্ষিণে হাসনাবাদের কাছে সুন্দরবন প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে চাষবাসের কাজ খুব বেশী দিন পূর্বে আরম্ভ হয় নাই। ২৪ পরগণার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানে ঘন সন্নিবিষ্ট ছায়া সুশীতল গ্রামগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। বিস্তৃত খোলা মাঠের মধ্যে এখানকার পল্লীগুলি ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশালকায়া নদী বা সুদীর্ঘ মাটির বাঁধের দ্বারা দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর খণ্ডিত অবস্থায় দেখা যায়। এখানে সুন্দরবনের গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না; প্রায় সবই কাটিয়া শেষ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এখানকার জোতগুলি খুবই বড়, এবং আবাদ নামে পরিচিত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুটীরগুলি ধীরে ধীরে গ্রামে পরিণত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলির এখনও কোন নাম দেওয়া হয় নাই। তাহারা বিভিন্ন লট নম্বর দ্বারা পরিচিত। গোবরাখাল হাসনাবাদের নিকটে যমুনা নদী হইতে বাহির হইয়াছে, এবং সন্দেশখালির দক্ষিণে বিদ্যাধরীতে যুক্ত হইবার পূর্বে কয়েক মাইল পর্যন্ত ইহারা সমান্তরালে প্রবাহিত। হাসনাবাদ

সমভূমির পূর্বভাগের নিম্নভূমির জল এই খালের দ্বারাই নিঃসারিত হইয়া থাকে। ইহা একটি জলপথ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, এবং ইহার তীরে ধীরে ধীরে বহু গ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে। হারোয়া সমভূমি অঞ্চলে বহু নদী বা গাং পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পরে ইহাদের জলরাশি একত্রিত হইয়া 'পায়না আবাদে' প্রবেশ করিয়াছে। এই নাম হইতেই বুঝা যায় যে, এই আবাদে অতীতে চাষ করা হইত; বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে পুনরায় ইহাদের সংস্কার করা হয় নাই, ফলে চাষের জমি জলমগ্ন হইয়া যাওয়াতে আর কখনও চাষ আবাদ করা সম্ভবপর হয় নাই। এই ভাবে বহু কষ্টে তৈরী কৃষিজমি আবার পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলে আবাদী জমির পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। এই আবাদটি ও গোয়াবারিয়া প্রভৃতি অন্যান্য আরও কতকগুলি আবাদে চাষ না হইলেও প্রচুর মাছ ধরা হয় বলিয়া ইহাদের উপকারিতা কিছু আছে। কিন্তু এমন বহু কৃষিজমি আছে যাহা বর্তমানে বিশেষ কোন কাজে আসিতেছে না। চতুষ্পার্শ্বস্থ বাঁধের প্রতি জমিদাররা মনোযোগ না দেওয়ায় জমির উর্বরতা শক্তি ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে, এবং কিছু দিন পরে একেবারে উৎপাদন শক্তি রহিত হইয়া পড়িবে। বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আবাদী জমির মধ্যে সহজেই লবণাক্ত জল প্রবেশ করিয়া শস্যের ভীষণ ক্ষতি করে। পোর্টক্যানিংএর বিপরীত দিকে আমঝাড়া নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ ধানজমিগুলি এই ভাবেই দ্রুত নষ্ট হইতেছে; এই গ্রামের চাষীরা বহু কষ্টে অল্প কিছু



ফটোচিত্র ৪১—প্রাচীন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য

[প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এই অঞ্চলটিকে পশ্চিম ইউরোপের সমতল ভূমির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঢেউ খেলান মাঠ, দূরে দূরে ঘর বাড়ী ছোট ছোট আঁকা বাঁকা নদী এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। (পৃষ্ঠা ১০৩)]



ফটোচিত্র ৪২ – ধান কাটার পর মাঠে গোচারণ

[নদীর নোনা জল ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করায় **আমঝাড়া** গ্রামে ধান ভাল হয় না, গোচারণ ভূমির এখানে যথেষ্ট অভাব। (পৃষ্ঠা ১০৪, ১০৫)]



ফটোচিত্র ৪৩—
বাঁধ দেওয়া জমির জল নিকাশের পাকা দ্বার

[বাঁধে ঘেরা জমির মধ্যে সঞ্চিত বৃষ্টির জলকে বাহির করিয়া দিবার জন্য বাঁধের উপর নির্মিত একটি পাকা দ্বার চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১০৫)]



ফটোচিত্র ৪৪ —হাসনাবাদ– মৎস্য রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র

[হাসনাবাদের প্রধান মাছের হাট, চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১০৬)]

মোটা ধান উৎপাদন করে ; কোন প্রকারের শাকসব্জী এখানে উৎপন্ন হয় না। গবাদি পশুগুলি খাদ্যাভাবে জীর্ণশীর্ণ ; এই গ্রামের বর্তমান বাঁধটিকে মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন, এবং আর একটি বাঁধ নির্মাণ করিলে দুইটি বাঁধ মিলিয়া ধান জমিকে রক্ষা করিতে পারে। বাঁধের মাঝে মাঝে জল নিষ্কাশনের জন্য পাকা দ্বার রাখিয়া মাঠে সঞ্চিত বর্ষার জল বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য এরূপ দ্বার কোথাও কোথাও দেখা যায় ; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। ভাঙ্গর সমভূমি অঞ্চলে নৌকা চলাচলের উপযোগী বহু খাল থাকায় খালের ধারে ধারে বড় বড় গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। হারোয়া গাঙ্গের সহিত কলিকাতাকে যুক্ত করিবার জন্য এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া একটি বড় খাল (গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্কক্যানাল) খনন করাইবার প্রস্তাব এখনও কার্যকরী হয় নাই। উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত খালগুলির মধ্যে বিদ্যাধরীর খালই প্রধান। ইহা ভাঙ্গর কাটাখালের সহিত হারোয়া গাঙ্গের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই খালের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে কতকগুলি বিল অবস্থিত। এই বিলগুলি উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত, এবং এক সময়ে কলিকাতার পূর্বে অবস্থিত জলাভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনপুর জলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন মাত্র কলিঙ্গ ও কাদা বিলের কোথাও কোথাও গ্রীষ্মকালেও জল থাকে ; অন্যান্য সকল বিলের জল শুকাইয়া যায়। সম্ভবত এক সময়ে একটি নদী এই বিল অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। এই অঞ্চলের বিল

গুলির চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা ও হোগলা জন্মে। জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘর ছাইবার জন্য গোলপাতা ও হোগলার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। আরও একটু পশ্চিমে ধাপার বিলে শীতকালে প্রচুর পরিমাণে বাঁধা ও ফুলকপি উৎপন্ন হয়, এবং কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে।

জনসংখ্যার ঘনতা পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বদিকের দুইটি সমভূমিতে মাইল প্রতি জনসংখ্যা ৭৫০; কিন্তু কলিকাতার সন্নিকটবর্তী হওয়ার দরুণ ভাঙ্গর ও রাজারহাট সমভূমির মাইল প্রতি লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৯০০ এবং ১২০০। বাতাগাছি গাং হইতে পশ্চিমদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে, গ্রামগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নদী বা খালের তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হাসনাবাদ একটি প্রধান মৎস্য রপ্তানির কেন্দ্র। এই বন্দরে সুন্দরবনের বনজাত দ্রব্য ও মৎস্য বোঝাই অসংখ্য নৌকা দেখা যায়। হাসনাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে একটি শাখা লাইন সোজা ইছামতীর তীরে অবস্থিত মাছের হাটে চলিয়া গিয়াছে যাহাতে কলিকাতায় মাছ চালান দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব না হয়। ভাঙ্গর বন্দর হইতে প্রধানত শাকসব্জী এবং হাঁস ও মুরগী কলিকাতার বাজারের জন্য চালান দেওয়া হয়। মাতলা অথবা পোর্টক্যানিং মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে জনবসতির অল্পতার জন্য মাতলাকে বন্দরে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। গরান, ধোন্দল ও গেঁয়োর খুঁটি, জ্বালানী কাঠ, মোম ইত্যাদি সুন্দরবন হইতে প্রথমত ক্যানিং

বন্দরে জড় হয়; পরে বাংলা দেশের সর্বত্র চালান দেওয়া হয়। মাতলা নদী যাহাতে ক্যানিং বন্দরের কোন ক্ষতি করিতে না পারে, সেজন্য ইষ্টক নির্মিত একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। শহরের উত্তরাংশে অবশ্য বাঁধটি এখনও পাকা হয় নাই। কাঁচা মাটির বাঁধ যখন জলের প্রবল স্রোতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন বাঁশের ছাউনী দ্বারা সেই বাঁধ রক্ষা করা হয়। ভাঁটার সময় যখন নদীর জল কমিয়া যায় তখন মাটীর বাঁধ দিয়া নদীর কতকটা ঘিরিয়া ফেলা হয়, এবং ঘেরা নদীর গর্ভ হইতে প্রচুর মাছ ধরা হয়।

এই অঞ্চলের সমগ্র ভূমির শতকরা ৬৫ হইতে ৭৪ ভাগ অংশে চাষ করা হইয়া থাকে। চাষের জমি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বেশী। কর্ষণযোগ্য অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ হাস্‌নাবাদে সবচেয়ে কম, মাত্র শতকরা ৬ ভাগ; অন্যত্র সামান্য কিছু বেশী। কর্ষণের অযোগ্য ভূমির আয়তন ভাঙ্গর সমভূমিতে সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রাচীন সুন্দরবনের উৎপন্ন শস্যের মধ্যে আমন ধানই সর্বপ্রধান। হাস্‌নাবাদ অঞ্চলে চাষের জমির শতকরা ৯০ ভাগে আমন ধানের চাষ হয়; রাজারহাটে এবং হারোয়া সমভূমিতে যথাক্রমে শতকরা ৮২ ও ৮৫ ভাগ আমন ধান জমি আছে। ভাঙ্গরে আমন ধানের চাষ কিছু কম হয়। মাথাপিছু আমনধান হাস্‌নাবাদে প্রায় ১৪ মণ উৎপন্ন হয়; হারোয়া অঞ্চলে ১১ মণ, এবং অন্যত্র ৭ মণের সামান্য কিছু বেশী। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে সুন্দরবনে উৎপন্ন প্রায় সমুদায় চাউলই কলিকাতার বাজারে বিক্রয়

হইত, এবং ভাঙ্গর ও রাজার হাট সমভূমিতে উৎপন্ন ফলমূল ও শাকসব্জী কলিকাতার বাজারে সরবরাহ করা হইত।

প্রাচীন সুন্দরবনে লাঙ্গলের সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৯৭ হইতে ১৩১ এর মধ্যে। এই অঞ্চলে চাষের কাজ ভাঙ্গর ও রাজারহাট অপেক্ষা হাস্‌নাবাদে ভাল হয়, কাজেই, শেষোক্ত অঞ্চলে লাঙ্গলের সংখ্যা অধিকতর। পূর্বোক্ত অঞ্চলে গবাদি পশু, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যাও কম। হাস্‌নাবাদ অঞ্চলে নৌকাই প্রধান যানবাহন।

(৬) আবাদী সুন্দরবন

আবাদী সুন্দরবন উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার আয়তন ১৩৮৯ বর্গ মাইল, এবং অধিকাংশ ভূভাগ ৬টি থানায় বিভক্ত—সন্দেশখালী, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ ও সাগর। পশ্চিমে ইহা প্রায় সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত; এই অংশে যাতায়াতের সুবিধা আছে বলিয়া চাষের জমি দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত রেলে গিয়া, সেখান হইতে মোটর গাড়ীতে কাকদ্বীপে অনায়াসে যাওয়া যায়। কুলপী পর্যন্ত রাস্তা ভালই; তাহার পরে পথের অবস্থা খুবই খারাপ। কুলপী রোডের কাকদ্বীপ-কুলপী অংশের সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন; তাহা না হইলে এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা কম। কাকদ্বীপ পৌঁছিবার কিছু পূর্বে রাস্তাটি একটি বাঁশের সেতুর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সেতুটি

যে কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বাসন্তী আবাদে, পোর্ট ক্যানিং হইতে বাসন্তী আবাদ ছাড়া, সুন্দরবনের অন্যান্য আবাদ অঞ্চলে ভাল রাস্তা নাই বলিলেই চলে। পোর্ট ক্যানিং হইতে ষ্টীমলঞ্চে প্রায় চার ঘণ্টায় গোসাবা গ্রামে যাওয়া যায়। এই অঞ্চলে স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটনের এক বিস্তীর্ণ জমিদারী আছে। তাঁহার চেষ্টায় এখন এখানে সমবায় প্রথার ভিত্তিতে চাষবাস হইতেছে। সুন্দরবনের জমি উন্নয়ন করিয়া চাষের জন্য কৃষকদের বিলি করিয়া দেওয়া হয়। এখানকার চাষীরা বহু বিষয়ে সাবলম্বী। সাগরদ্বীপ ও কাকদ্বীপের মধ্যে নিয়মিতভাবে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে। একটি ভাল পাকা রাস্তা এই দ্বীপটির উত্তর হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বিভিন্নমুখী অসংখ্য নদী ও নালা রাস্তার অভাব কতকটা মোচন করে, যদিও জলপথে চলাচলের গতি অত্যন্ত মন্থর। কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে আসাম যাইবার প্রধান জলপথ আরও দক্ষিণে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাওয়ায় আবাদী সুন্দরবনের অধিবাসীদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। এই অঞ্চলের সম্যকরূপে উন্নয়নের পথে চারিটি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। প্রথমত, ভাল রাস্তাঘাটের অভাব। দ্বিতীয়ত, জল নিঃসারণের অব্যবস্থা; এস্থানের জমি অত্যধিক নীচু বলিয়া বর্ষার জল সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বহু খাল কাটান হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই চওড়ায় এত ছোট যে, তাহাদের দ্বারা জল নিকাশের কাজ ভাল ভাবে হয় না।

এই খালগুলিকে প্রশস্ত করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, আবাদী জমিকে লবণাক্ত জলের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য সুদৃঢ় বাঁধের প্রয়োজন। অধিকাংশ বাঁধগুলিই কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নির্মাণ করা হয় নাই; কাজেই, এখন আর সেগুলি জোয়ারের লবণাক্ত জল প্রতিরোধ করিতে পারে না। পানীয় জলের অভাব এই অঞ্চলের অন্যতম সমস্যা। এখানকার সমস্ত নদীগুলিই অপেয় লবণাক্ত জল বহন করে; কাজেই বহুকষ্টে সঞ্চিত বৃষ্টির জলের উপরেই এস্থানের অধিবাসীদের সারা বৎসর নির্ভর করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে যখন পানীয় জলের পুষ্করিণী গুলি শুকাইয়া যায় তখন এই সমস্যা তীব্রতম হইয়া উঠে।

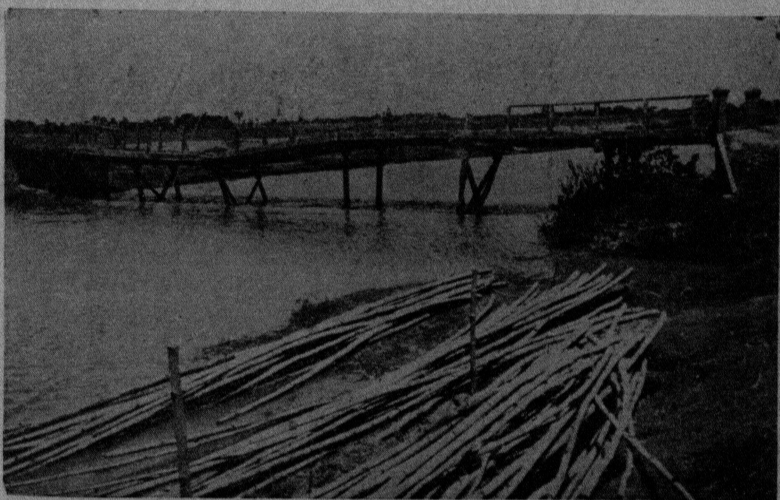
আবাদী সুন্দরবনের উত্তরাংশে উদ্ভিদের ছোট ঘাস ও গুল্মই প্রধান; গাছগাছড়া বড় একটা দেখা যায় না। একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কুলপীর সন্নিকটে পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন স্তূপ অবস্থিত। ইহা দেখিতে অনেকটা মন্দিরের মত; কিন্তু ইহা কুলপী প্যাগোডা বা মনিবিবির কবর নামে পরিচিত। গঙ্গার তীরে বানগাছের ঝোপ (mangrove) মাটির উপরে শীকর বিস্তার করিয়া থাকিতে দেখা যায়।

সুন্দরবনের অধিকাংশ আবাদেই কৃষাণ মজুরের সাহায্যে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। সাধারণত বীজ বপন ও ধান্য রোপণের পরেই ইহারা নিজেদের গৃহে ফিরিয়া যায়। ধানের চারা তখন আপনা আপনি বাড়িতে থাকে। বড় বড় ধানের ক্ষেত



ফটোচিত্র ৪৫—কুলপী হইতে কাকদ্বীপে যাইবার একমাত্র পথ

[ভাল রাস্তার অভাবে আবাদী সুন্দরবনের সম্যক উন্নয়ন যে সম্ভবপর নহে, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত রাস্তাটির অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রাস্তার উপর সদ্য ফেলা এঁটেল মাটিতে মোটরটি আটকাইয়া গিয়াছে। (পৃষ্ঠা ১০৮)]

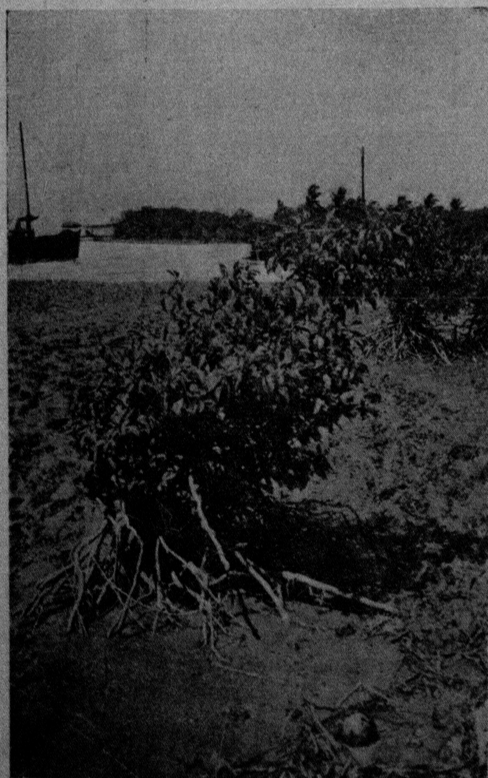


ফটোচিত্র ৪৬—কাকদ্বীপের পথে একটি খাল ও তাহার উপর পুল

[এরূপ অপলকা পুলের উপর দিয়া ভারী ভারী গাড়ী যাওয়া সম্ভবপর নহে। (পৃষ্ঠা ১০৮, ১০৯)]



ফটোচিত্র ৪৭—আবাদী সুন্দরবনে জল নিকাশের একটি খাল (পৃষ্ঠা ১০৯)



ফটোচিত্র ৪৮—

কাকদ্বীপে মুড়ী গঙ্গার তীরে বানগাছের ঝোপ

[সুন্দরবনের এই প্রকারের গাছের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের শিকড় সাধারণত মাটির উপরে থাকে কিন্তু জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়। (পৃষ্ঠা ১১০)]

সমস্ত অঞ্চলটি জুড়িয়া রহিয়াছে, অথচ ইহাদের ত্রিসীমানায় জনমানবের চিহ্ন নাই—এরূপ দৃশ্য বিরল নহে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষকেরা তাহাদের ধানের ক্ষেতের আশেপাশেই বসতি স্থাপন করিয়াছে। কাঁচা ইঁটের এবং স্থানীয় গোলপাতার সাহায্যে তাহারা বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর কুটীর নির্মাণ করিতে অভ্যস্ত। কুটীরের চতুর্দিকে মাটির দেয়ালের উপর খেজুর কাঁটার বেড়া দিয়া আপন আপন গৃহ প্রাঙ্গণে শাকসব্জী উৎপন্ন করে। কৃষক পল্লীর চতুর্দিকে দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলের মত সবুজ গাছপালা দেখা যায় না। অন্যান্য অঞ্চলের মত গবাদি পশুদিগকে তাহারা ডাল ও অন্যান্য শস্যাদি মাড়াইবার কাজে নিযুক্ত করিয়া থাকে।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাস করে। ইহাদের চাহিদা মিটাইবার জন্য আবাদী সুন্দরবনের বহু স্থানে ছোট ছোট হাট বসিয়া থাকে। কৃষি এবং কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য দ্রব্যগুলি এই সমস্ত হাটে বিক্রয় হয়। এই অঞ্চলে ঘন-জন-বসতিপূর্ণ কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নাই। সুন্দরবনের কৃষিজাত বহু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় কাকদ্বীপে হয়, কাজেই এই গ্রামটি সুন্দরবনের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে ধীরে ধীরে পরিণত হইতেছে। এই গ্রামের মন্দিরটি বাংলাদেশের অতি প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম।

আবাদী সুন্দরবনে প্রতি বর্গ মাইলে জনবসতি ২০১ হইতে ৬২৩ এর মধ্যে। সন্দেশখালী, ক্যানিং, জয়নগর এবং

মথুরাপুরের কতকাংশে চাষ আবাদ বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, ফলে লোকের বাস এই অংশে কিছু বেশী। কাকদ্বীপে সমগ্র জমির শতকরা ৭৩ ভাগে চাষ হয়। অন্যত্র শতকরা ৫৩ হইতে ৬৯ পর্যন্ত চাষের জমি। মথুরাপুরে কর্ষণ যোগ্য অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক, শতকরা ২৪ ভাগ; অন্যত্র ১০ ভাগের সামান্য কিছু বেশী। পূর্বাংশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি কর্ষণের অযোগ্য। অন্যান্য অংশে সমগ্র জমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশে বর্তমানে কিছু উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। আবাদী সুন্দরবনে একমাত্র আমন ধানেরই চাষ হইয়া থাকে; কাজেই সমগ্র জেলার মধ্যে রপ্তানিযোগ্য বাড়তি চালের পরিমাণ এখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার ছয়টি থানার মধ্যে চারিটিতে মাথাপিছু উৎপন্ন আমনের পরিমাণ প্রায় ২০ মণ। কৃষাণেরা আপন আপন জেলা হইতে লাঙ্গল লইয়া আসে বলিয়া প্রতি হাজার একরে এক শতেরও কম লাঙ্গল রহিয়াছে। গোচারণ-ভূমির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গরুর গাড়ীর সংখ্যা এই অঞ্চলে খুব কম, কারণ, নৌকাই এখানকার প্রধান যানবাহন; নৌকার সংখ্যাও প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক কম।

(৭) বনগাঁ সমভূমি অঞ্চল

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারায় যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমার দুইটি থানা—বনগাঁ ও গায়ঘাটা পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়।

এই অঞ্চলটিকে বর্তমানে ২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার আয়তন ৩২০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১½ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে এখানে ৪১৬ জন লোক বাস করে। আমডাঙ্গা-স্বরূপনগরের সহিত এই অঞ্চলের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যমুনা ও ইছামতী এখানকার দুই প্রধান নদী। যমুনা আঁকিয়া বাঁকিয়া এই অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া চলিয়াছে। এখানে গ্রীষ্মকালেও যমুনায় জল থাকে, এবং যমুনার তীরে **গাইঘাটা** ও **ইছাপুর**, এই দুইটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। চৈতা ও যমুনা সঙ্গমের কিছু উত্তরে যমুনার তীরে একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি প্রকাণ্ড হ্রদ দেখা যায়। যশোহর রোডের উপরে অবস্থিত বলিয়া গাইঘাটা হইতে সহজেই কৃষিজাত দ্রব্য কলিকাতায় পাঠান যায়। যমুনার পশ্চিমে ছোট ছোট নদীগুলি মজিয়া গিয়াছে, ইহাদের সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক। বনগাঁ থানার প্রায় মধ্য ভাগ দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইছামতীরও উভয় পার্শ্বে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। গাঁরাপোতা গ্রাম এইরূপ একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত। ইছামতীর তীরে অবস্থিত **বনগাঁ** সহর এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। চতুর্দিক হইতে বড় বড় রাস্তা ও রেলপথ আসিয়া এই সহরে মিলিত হইয়াছে। আর দুইটি নদী, কোদালিয়া ও বেতনা, এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব অংশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বেতনার তীরে অবস্থিত **বাগদহ** অন্যতম বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কপোতাক্ষী নদী এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত ছুঁইয়া পূর্বদিকে ঘুরিয়া

গিয়াছে। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই বহু খাল, বিল, হ্রদ ও পুষ্করিণী আছে। কৃষিকার্যের জন্য এই অঞ্চলে জলের কোন অভাবই হয় না। জলের প্রাচুর্যই বরং কৃষিকার্যের ক্ষতি-কারক। বর্ষার জল যদি সুষ্ঠুভাবে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বনগাঁর কৃষিসম্পদ সমধিক বৃদ্ধি পাইবে।

এই অঞ্চলের সমগ্র কৃষিজমির আয়তন ১,৫০,৭১৯ একর। ইহার মধ্যে ৩০ হাজার একর জমি হইতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয়। আরও ৩০ হাজার একর জমি চাষ হইতে পারে; কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ইহা বর্তমানে বিশেষ কোন কাজেই আসিতেছে না। ধানই এ অঞ্চলের প্রধান শস্য। আমন ও আউস—উভয় ধানই এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তবে আমনের পরিমাণ আউসের চেয়ে কিছু বেশী। কিছু পাটও এ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছোলা, মুসুর ও সরিষা প্রধান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

২৪ পরগণার সুন্দরবন

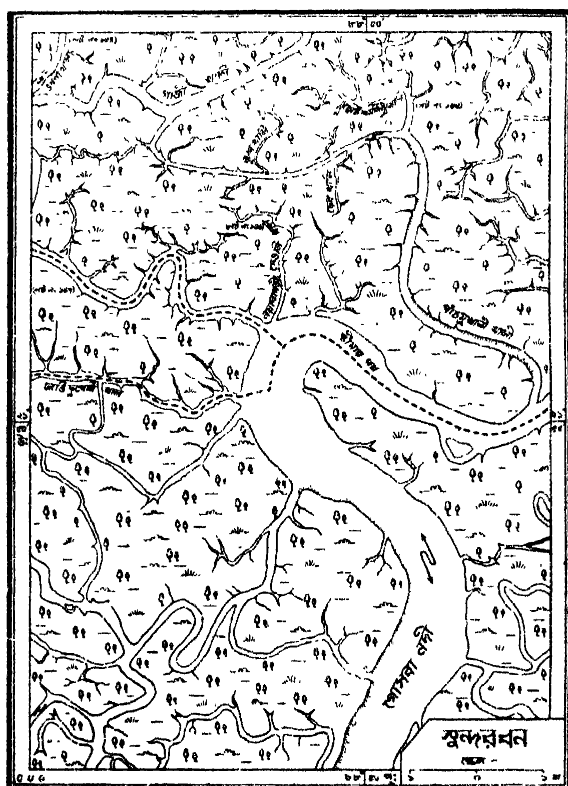
সুন্দরবনের নামকরণ হইতে বোঝা যায় যে, ইহা এক সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। পুরাকালে সুন্দরবনের নানা স্থানে লোকেরা বসবাস করিত, এবং বহু হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও জৈন মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে সুন্দরবনের সমৃদ্ধশালী বহু নগরী জনশূন্য হইয়া পড়ে, এবং ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙ,এর লিখিত ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিলে সুন্দরবনের প্রাচীন গৌরবের কাহিনী জানিতে পারা যায়। এই অঞ্চল তখন সমুদ্রতটবর্তী সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংস স্তূপগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই; সাগরদ্বীপের এবং অন্যান্য স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে মাটির নীচে বহু ধ্বংস স্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সুন্দরবনের আর সেই সৌন্দর্য নাই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমুদ্রের জল বিভিন্ন খাত দিয়া এই অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং অধুনা ইহা জনমানব-শূন্য গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কাজেই, সুন্দরবনের নামকরণের অন্যান্য কারণ বর্তমানে দেখান হইয়া থাকে। কাহারও মতে সমুদ্রের সান্নিধ্যের জন্যই ইহার নাম হইয়াছে সমুদ্রবন বা সুন্দরবন। আবার কেহ কেহ

মনে করেন যে, সুঁদরী বা সুন্দরী গাছের আধিক্যের জন্যই এই বনের নাম রাখা হইয়াছে সুঁদরী বা সুন্দরবন।

২৪ পরগণা সুন্দরবনের যে অংশে এখনও ঘন বন সংরক্ষিত, তাহা পশ্চিমে সপ্তমুখীর মোহানা হইতে পূর্বে রায়মঙ্গল নদীর মোহানা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উত্তরে ইহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া সাহেবখালী গ্রামের নিকট শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদীগুলি—সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ বা জামীরা, মাতলা, বিদ্যা, গোসবা, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল, উত্তর হইতে দক্ষিণে সমান্তরালে প্রবাহিত হইলেও, পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত অসংখ্য খালও গাং-এর দ্বারা ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া আছে ; সুতরাং এক নদী হইতে অন্য নদীতে সহজেই যাতায়াত করিতে পারা যায়। নদীর জল লবণাক্ত। নদীতে সমুদ্রের মত জোয়ারভাঁটা খেলে, এবং জোয়ার ও ভাঁটার সাহায্য লইয়া নদীপথে নৌকা ও ষ্টীমারগুলি চলাচল করিয়া থাকে। বর্ষাকালে বড় বড় নদীগুলিতে দুইটি বিপরীত-মুখী জলস্রোত বহিতে থাকে ; বর্ষার জলের স্রোত উত্তর হইতে দক্ষিণে, এবং সমুদ্রের স্রোত দক্ষিণ হইতে উত্তরে বহিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের নদীগুলির সহিত গঙ্গার কোন যোগাযোগ না থাকায় নদীর জলে লবণের মাত্রা, বিশেষ করিয়া শীতকালে, বহুল পরিমাণে থাকে। এই কারণে সুন্দরবনের বহু স্থানে পুরাকালে লবণ তৈয়ারীর কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাতলা ও গোসবা এই অঞ্চলের দুইটি প্রধান নদী। এই দুই নদী

এবং তাহাদের সংযোগকারী খালের মধ্য দিয়া বড় বড় ষ্টীমার মাল লইয়া কলিকাতা হইতে পূর্ববঙ্গে ও আসামে নিয়মিত-



মানচিত্র ১৩—গভীর জঙ্গলমধ্যে গোসবা নদী ও তাহার অসংখ্য-শাখা-প্রশাখা ; ষ্টীমার পথটি পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত।

রূপে যাতায়াত করে। গোসবা নদী তাহার শাখা প্রশাখাকে কি ভাবে সুন্দরবনের মধ্যে বিস্তার করিতেছে, তাহা ষ্টীমার হইতে বেশ দেখা যায় (মানচিত্র ১৩)।

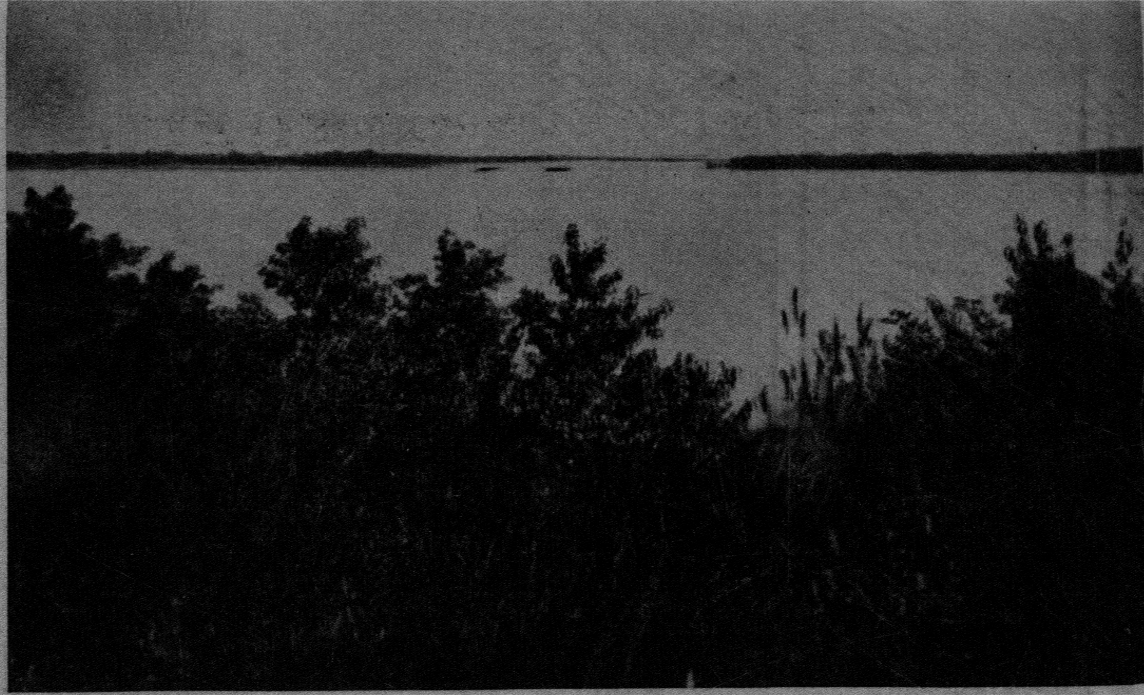
সুন্দরবনের আয়তন ১৬৩০ বর্গমাইল হইলেও, ইহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ নদী ও নালা অধিকার করিয়া আছে। স্থল-ভাগের অধিকাংশই নদী বেষ্টিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু দ্বীপে বিভক্ত। দ্বীপগুলির মধ্যভাগ নীচু ও জলাভূমি, এবং চতুষ্পার্শ্ব নদীর তীর হইতে খাড়া উপরে উঠিয়াছে। বর্ষাকালে অধিকাংশ দ্বীপের প্রায় সবটাই ডুবিয়া যায়, এবং শীতকালে জল সরিয়া গেলে দ্বীপগুলি জাগিয়া উঠে। দ্বীপের উপরিভাগ এঁটেল মাটি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার দ্বারা গঠিত।

নদীর জল নোনা বলিয়া এখানে এমন গাছ পালার আধিক্য দেখা যায়, যাহারা নোনা মাটি ভালবাসে। সুন্দর বনের যে অঞ্চল প্রতিদিন জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়, সেই অঞ্চলে মাটির উপরে শীকর বিশিষ্ট বাণগাছ (ম্যানগ্রোভ) প্রচুর জন্মে। সমুদ্র তট হইতে দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য সুঁদরী গাছ দেখা যায়। সুঁদরী গাছ লম্বায় ৪০ হইতে ৫০ফুট পর্যন্ত হয়। ইহার কাঠ বেশ শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়; কাঠের রং লাল। ইহা সাধারণত নৌকা নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হয়; টেবিল চেয়ার প্রভৃতি নির্মাণের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী। সুন্দরবনের জঙ্গলে সুঁদরী গাছ ছাড়া আরও অনেক প্রকার গাছ জন্মে। ইহাদের মধ্যে পশুর, ধোন্দল, গরাণ, কাঁকড়া, কেওড়া, ও গেঁয়ো প্রধান। পশুর গাছ লম্বায় প্রায় ৬০ ফুট; ইহার কাঠ খুব শক্ত, কাজেই ছুরী হাতুড়ী প্রভৃতির বাঁট নির্মাণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কাঠের রং সাদা, যদিও কাঠ কাটার কিছুদিন পরে ইহা লালচে হইয়া যায়। এই গাছের ভিতর



ফটোচিত্র ৪৯—সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল

[কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদিগকে চিত্রে দেখা যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১১৮)]



ফটোচিত্র ৫০— সুন্দরবনের বিশালকায়া নদী ও উপনদী

[সুন্দরবনের এক বড় অংশ যে নদীদ্বারা অধিকৃত তাহা এই ছবিটি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। দূরে নদীর তীরে গাছপালার কাল রেখা। (পৃষ্ঠা ১১৮)]

হইতে পরিষ্কার এক রকম আঠা বাহির হয়। পশুর গাছের ফল হইতে একপ্রকার তৈল বাহির করা হয়, যাহা রেড়ীর তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধোন্দল গাছ লম্বায় অপেক্ষাকৃত ছোট, মাত্র ৪০ফুট। ইহার কাঠ অনেকটা পশুরের কাঠের মত। ইহার ফলের সাহায্যে কাঁচা চামড়াকে পাকা করা হয়। গরাণ গাছ সাধারণত ১২ হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার কাঠ লাল ও বেশ শক্ত। চালা ঘরের খুঁটি এই কাঠে বেশ ভাল হয়। ইহার কাঠ হইতে খুব ভাল কাঠকয়লা হয়। এই গাছের ছাল হইতে একপ্রকার লাল রং তৈয়ারী করা হয়, এবং চামড়া পাকা করার কার্যেও ইহার ছাল ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্যে কাঁকড়া গাছ প্রচুর জন্মে। লম্বায় ইহা প্রায় ৪০ ফুট। ঘরের কড়ি, বরগা, খুঁটি প্রভৃতি নির্মাণে ইহার কাঠ বিশেষ উপযোগী। ইহার ছাল চর্ম সংশোধনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত বড় বড় নদীর তীরে কেওড়া গাছই বিশেষ করিয়া দেখা যায়। ইহা ৫০ হইতে ৬০ ফুট লম্বা হয়। কাঠ বেশ শক্ত হয়, এবং বাড়ীর আসবাবপত্র নির্মাণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গেঁয়ো গাছ সাধারণত লম্বায় ৩০ হইতে ৫০ ফুট। ইহার কাঠ নরম ও রং সাদা। জ্বালানী কাঠ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। নদীর তীরে এবং জলাভূমির প্রায় সর্বত্র তাল জাতীয় গোলপাতার গাছ জন্মে। ইহার বড় বড় পাতাগুলি কাটিয়া ঘর ছাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া হয়। কচি পাতাগুলি বুনিয়া শক্ত দড়ি তৈয়ারী করা হয়। ইহার ফল

বেশ সুমিষ্ট। এই গাছের রস লোকেরা পান করে। ঘর ছাইবার পক্ষে হোগলাও ব্যবহৃত হয়। সুন্দর বনের নদীর ধারে হোগলাও প্রচুর জন্মে। বিভিন্ন প্রকার কাঠ, তাল জাতীয় ফল এবং হোগলা ও গোলপাতা ছাড়া সুন্দর বনের জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়। সুন্দরবনের প্রবেশ পথে গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগের আটটি ঘাঁটি আছে; ইহাদের নাম—সাহেবখালি, রামপুর, বাসন্তি, মাতলা, কুলতলা, নলগোরা, নামখানা ও শিকারপুর। উপরোক্ত যে কোন একটি ঘাঁটি হইতে ছাড়পত্র লইয়া কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে পারে। নৌকার আয়তন ও কাঠুরেদের সংখ্যার উপর প্রবেশ মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সাধারণত ৫০০-মনীর বড় কোন নৌকাকে সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৪ পরগণায় সুন্দরবনকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে।

বহুপ্রকার হিংস্র প্রাণীর আবাসস্থল বলিয়া সুন্দরবনের জঙ্গল শিকারীদের একটি প্রিয় স্থান। সুন্দরবনের বাঘের মত হিংস্র ও শক্তিশালী জন্তু বড় একটা দেখা যায় না, সেইজন্যই ইহার নাম রয়াল বেঙ্গল টাইগার। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে কেঁদো বলে। ইহা উচ্চতায় প্রায় ৪ ফুট, এবং দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট পর্যন্ত হয়। সুন্দরবনে প্রতি বৎসর বহু কাঠুরে ও মাঝি বাঘের হাতে প্রাণ হারায়। অন্যান্য বন্যজন্তুদের মধ্যে বন্য

মহিষ ও গণ্ডার উল্লেখযোগ্য। বন্যমহিষরা অত্যন্ত হিংস্র হয়। গণ্ডারের সংখ্যা সুন্দরবনে খুব কমিয়া গিয়াছে। বন্য-বরাহ ও হরিণ শিকার করিতেও অনেকে সুন্দরবনে যান। সুন্দরবনে বহু প্রকার বিষধর সর্প আছে। ইহাদের মধ্যে অজগরই প্রধান। অজগরগুলি এতবড় যে, তাহারা অনায়াসে মানুষ বা হরিণকে গিলিয়া খাইতে পারে। অজগর ছাড়া কেউটে, গোখরো, মণিরাজ, শঙ্খচূড় প্রভৃতি সাপের নাম করা যাইতে পারে। সুন্দরবনের ডাঙ্গায় যেমন বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর ভয়ে লোকেরা ভীত, জলেও তেমনি মানুষখেকো হাঙ্গর ও কুমীরের হাতে পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই।

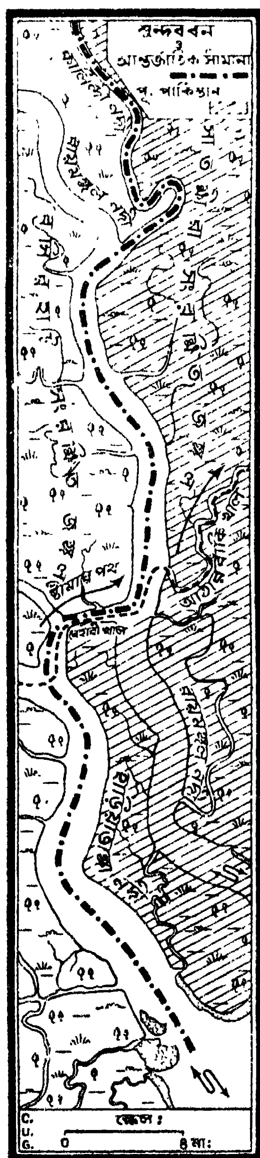
নবম পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক সীমানা

বঙ্গবিভাগের পর ২৪ পরগণা একটি সীমান্ত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্বদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত খুলনা ও যশোহর জেলা অবস্থিত। বঙ্গ বিভাগের সময় ২৪ পরগণায় নূতন করিয়া কোন সীমানা রেখা টানা হয় নাই। পূর্বতন স্থানীয় সীমানাকে এখন আন্তর্জাতিক সীমানার পদমর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিবেশী দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সহিত পূর্ববঙ্গের সীমানাগত বিরোধ উঠিয়াছে, এবং সেই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য এক আন্তর্জাতিক সীমা নির্দ্ধারণ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সীমানা এমন ভাবে টানা উচিত, যাহাতে ভবিষ্যতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের কোন কারণ না উঠিতে পারে। পৃথিবীর বহু দেশে সীমান্তের গণ্ডগোল লইয়াই প্রতিবেশী দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক সীমানা এমন হওয়া উচিত, যাহা দূর হইতে সহজে লোকের নজরে পড়ে, যেমন সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী বা বিশালকায়া নদী। দ্বিতীয়ত, সমশ্রেণীর অঞ্চল আন্তর্জাতিক সীমানার দ্বারা বিভক্ত না হইলেই ভাল। তৃতীয়ত, ইহার দ্বারা কোন জলপথ বা স্থলপথ খণ্ডিত

হওয়া উচিত নহে। পর্বতের অভাব থাকিলেও নদীর কোন অভাব বাংলা দেশে নাই। ২৪ পরগণার আন্তর্জাতিক সীমানার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত তিনটি গুণের কোনটিই ইহাতে নাই।

বনগাঁ ও গাইঘাটা সহ ২৪ পরগণায় আন্তর্জাতিক সীমানা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২১০ মাইল; অর্থাৎ এই জেলার প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে ৪ মাইল সীমান্ত রেখা রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই দক্ষিণ হইতে উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; মাত্র ৩০ মাইল বনগাঁ থানার উত্তর প্রান্ত ধরিয়া পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে গিয়াছে। হাড়িয়াভাঙ্গা বা রায়মঙ্গলের মোহানা হইতে এই সীমানাটি উত্তর দিকে উঠিবার সময় প্রথম ৫০ মাইল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সীমানার পূর্বদিকে খুলনা জেলার সাতক্ষীরার গভীর জঙ্গল, এবং পশ্চিমে ২৪ পরগণার বসিরহাটের ঐ একই প্রকারের গভীর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বঙ্গবিভাগের ফলে দক্ষিণস্থ গভীর জঙ্গল দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ফলে, সুন্দরবনের সম্যক উন্নয়নের পথে বহুবিধ অন্তরায় দেখা দিবে। এই অঞ্চলের নদী ও খাল পরস্পরের সহিত এমন ভাবে জড়িত যে, ইচ্ছা করিলে নদীপথে সীমানার একদিক হইতে অন্যদিকে অনায়াসে গিয়া, সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া, আবার ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। সুন্দরবনের মধ্যে নদীর মোহানা হইতে প্রথম ২০ মাইল বিশালকায়া হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মাঝখান দিয়া সীমানা রেখাটি উত্তরে উঠে। পরে সয়া নদী ও বেহারী খালের মধ্য



মানচিত্র ১৪—সুন্দরবনের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা

দিয়া একটু পূর্ব দিকে বাঁকিয়া রায়মঙ্গল নদীতে প্রবেশ করে। ইহারই একটু উত্তরে আঠারবাঁকী খালে প্রবেশ করিবার পূর্বে কলিকাতা হইতে খুলনাগামী একটি প্রধান ষ্টীমার-পথ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সীমানা রেখাটি রায়মঙ্গল নদীর মাঝখান দিয়া উত্তরদিকে আরও ১৮ মাইল চলিবার পর, রায়মঙ্গল ও কালিন্দীর সঙ্গমের নিকট, কালিন্দী নদীতে প্রবেশ করে। এখানকার নদীগুলির মধ্যে রায়মঙ্গলই বঙ্গবিভাগের ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; ইহার উপর দিকটা এখন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, এবং নীচের দিকটা পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়িয়াছে (মানচিত্র ১৪)। পরে সীমানা রেখাটি কালিন্দীর একটা বিরাট বাঁক ঘুরিয়া, প্রায় ১২ মাইল চলিবার পর, কালিন্দী ও মাদার গাং-এর সঙ্গমের নিকট সুন্দরবনের

সংরক্ষিত গভীর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আবাদী সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বোক্ত কালিন্দীর বাঁকের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ শীঘ্রই এই বাঁকটি নদী কর্তৃক কাটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মাদারগাং পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমায় প্রবেশ করিয়াছে।

সুন্দরবন হইতে বাহির হইয়া সীমানা রেখাটি আবাদী অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কালিন্দী ও কাঁকশিয়ালী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত ২৮ মাইল উপরে উঠে। শেষোক্ত নদীটি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কালীগঞ্জের পাশ দিয়া আসিয়া, ইছামতী বা যমুনায় পড়িয়াছে। এই ২৮ মাইলের মধ্যে কালিন্দীর ৯টি বড় বাঁক আছে; এবং প্রায় প্রত্যেক বাঁকের কাছ হইতে কোন না কোন নদী বা খাল উঠিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এই বাঁকগুলির প্রতি সীমান্তরক্ষীদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কালিন্দীর এই অংশ হইতে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে যে নদীগুলি প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সাহেবখালী নদীই প্রধান; ইহা খুনবা বা আমবাড়িয়া গ্রামের নিকট কালিন্দী হইতে বাহির হইয়া, ২৪ পরগণার মধ্যে রায়মঙ্গল নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। নদীতীরে উভয় পার্শ্বেই ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়। ২৪ পরগণার দিকে গ্রামের সংখ্যা ১৩; দক্ষিণ হইতে উত্তরে ইহাদের নাম—সামসের নগর, কালীতলা, মালেকান ঘুমতি, শ্রীধরকাটি, কানাইকাটি, চাড়ালখালি, সাহেবখালি, ছোটসাহেব-খালি, আমবাড়িয়া, খোসবা, সিঙ্গেরকাটি, বাঁকরা ও হিঙ্গলগঞ্জ।

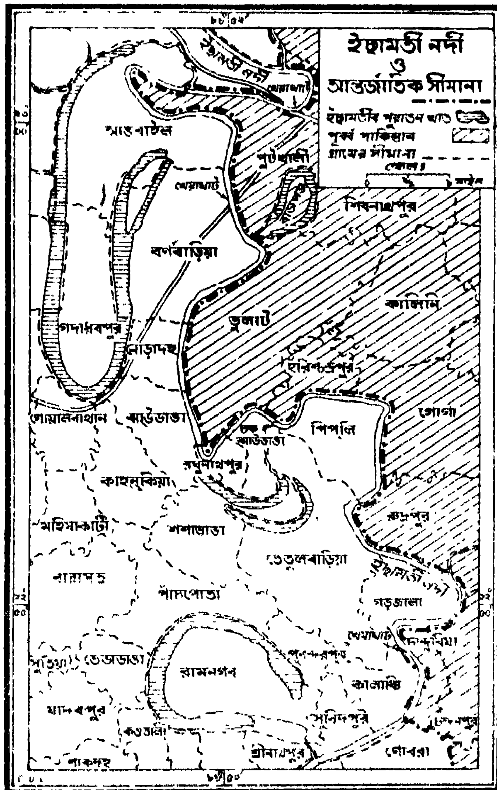
এই গ্রাম কয়টির মধ্যে **হিঙ্গলগঞ্জই** সব চেয়ে বড়। এই গ্রামে পোষ্টাপিস ও সরকারী হাসপাতাল আছে; এবং নদী পারাপারের খেয়া এইখানেই প্রথম দেখা যায়। হাসনাবাদ হইতে একটি মেটে রাস্তা হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত আসিয়াছে। হিঙ্গল-গঞ্জে সুন্দরবনের বনজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়। সীমানার একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিঙ্গলগঞ্জে স্থাপন করা আবশ্যক।

হিঙ্গলগঞ্জের উত্তরে আরও ২০ মাইল সীমানা ইছামতী নদীর মাঝখান দিয়া গিয়াছে। এই ২০ মাইলের মধ্যে ২৪ পরগণার দিকে যে লোকালয়গুলি নদীর তীরে অবস্থিত তাহাদের মধ্যে **টাকী** ও **হাসনাবাদ** প্রধান। টাকীর অপর পারে **শ্রীপুরটাউন** পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে। টাকীরোড হইয়া হাসনাবাদ পর্যন্ত বারাসাত বসিরহাট রেলের ছোট লাইন আছে। বঙ্গ বিভাগের পর এই রেল লাইনের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ ইহাই একমাত্র রেলপথ যাহা কলিকাতাকে ২৪ পরগণার আন্তর্জাতিক সীমানার সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। গৌরেশ্বর নদী বরুণহাট গ্রামের নিকট, এবং কাটাখালী নদী হাসনাবাদ শহরের এক প্রান্তে ইছামতীর এই অংশ হইতে বাহির হইয়া ২৪ পরগণার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ শহরের মধ্যে ৮টি গ্রাম—বরুণহাট, চাঁপাতলা, চর-নারায়ণপুর, চর-রামেশ্বরপুর, কালুতলা, হাসনাবাদ গ্রাম, শিমুলিয়া, অঙ্গনারা—অবস্থিত। হাসনাবাদের কাছে ইছামতীর দুইটি বড় বাঁক, এবং টাকীর কিছু উত্তরে

আর একটি বাঁক দেখা যায়। হাসনাবাদের কিছু উত্তরে ২৪ পরগণার বিখ্যাত সহর টাকী। সীমানার নিকটে অবস্থিত বলিয়া হাসনাবাদ ও টাকীকে আরও দুইটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করা দরকার। টাকীর উত্তরে নদীর পশ্চিম তীরে আর ৭টি গ্রাম—জালালপুর, পূর্বমধ্যমপুর, গোয়ালহাটি, দক্ষিণ বাগুণ্ডি, হরিহরপুর, সোলাদানা ও চর-মেদিয়া অবস্থিত।

চর-মেদিয়ার নিকট সীমানা রেখা ইছামতী ছাড়িয়া পূর্ব দিকে একটু ঘুরিয়া এই প্রথম স্থলভাগের উপর দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই ৩০ মাইল সীমানা ঠিক কোথা দিয়া গিয়াছে তাহা জমি দেখিয়া বিশেষ বুঝিবার কোন উপায় নাই, যদিও মাঝে মাঝে সীমানার ধার দিয়া কোন খাল বা নদীকে কিছুদূর পর্যন্ত যাইতে দেখা যায়। ইছামতী ছাড়িয়াই এরূপ একটি ছোট খাল ধরিয়া সীমানাটি প্রায় ৪ মাইল অগ্রসর হইবার সময় মাঝ পথে পাণিতার গ্রামে বসিরহাট-সাতক্ষীরা রোডটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এই রাস্তাটিকে বসিরহাট হইতে সাতক্ষীরার মধ্য দিয়া কপোতাক্ষী তীর পর্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে পাকা করা হইয়াছিল। পাণিতারএর উত্তরে সীমানার পশ্চিম ধারে ২১টি গ্রাম—বিবিদিয়া, পাইকরডাঙ্গা, গাছা, পূর্ব জয়নগর, সায়েস্তানগর, শোনপুর, গাবর্দা, সর্পরাজপুর, কাইজুরী, দোবিলা, বিলবল্লী খালশি, আমুদিয়া, নিত্যানন্দ-কাটি, তারালি, হাকিমপুর, অরশিকরি, বিঠারি, গুণরাজপুর, গোবিন্দপুর ও গোবরা অবস্থিত। এই গ্রামগুলির মধ্যে

সায়েস্তানগর ও বিঠারি প্রধান। সীমানাটি শোনপুর গ্রামের উত্তরে কয়েক মাইল সোনাই খালের গা ঘেঁসিয়া গিয়াছে। এই খাল বল্লী বিলের সহিত যুক্ত। আবার আমুদিয়া গ্রামের উত্তরে সোনাই নদী ধরিয়া সীমানাটি প্রায় ৬ মাইল গিয়া



মানচিত্র ১৫—আঁকা বাঁকা ইছামতী নদীর পূর্ব তীরে আন্তর্জাতিক সীমানা

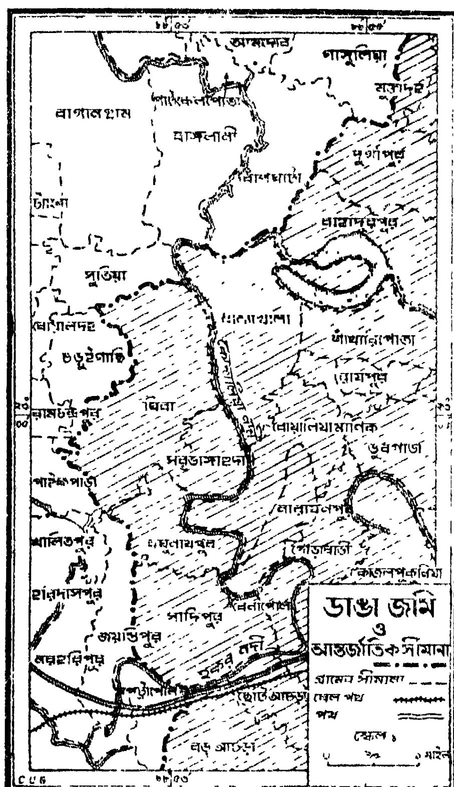
অরশিকরি গ্রামের নিকট পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। সীমান্তবর্তী এই নদীটি সোনাই খালের দ্বারা ইছামতীর সহিত

যুক্ত। সোনাই খালের এই অংশটি বল্লী বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্বরূপনগরের কিছু দক্ষিণে ইছামতীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

গোবরা গ্রাম হইতে সীমানাটি পুরন বনগাঁ পর্যন্ত আবার ইছামতী নদী ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ১৮ মাইল উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে (মানচিত্র ১৫)। গোবরা হইতে পুরন বনগাঁর সরল পথে দূরত্ব ইহার অর্ধেক মাত্র। ইছামতীর এই অংশে নদীর দুই পার্শ্বে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমে, বহু পুরাতন নদী-খাত দেখা যায়। বর্তমান খাত পরিবর্তন করিয়া জলপ্রবাহ ভবিষ্যতে অন্য এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে পারে; কাজেই, প্রথম হইতেই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। এই অংশে নদীর পশ্চিম তীরে ১১টি গ্রাম—কালাঞ্চি, গড়জালা, তেঁতুলবাড়িয়া, পিপলি, চকঝাউডাঙ্গা, রঘুনাথপুর, ঝাউডাঙ্গা, নোড়াদহ, বর্ণবাড়িয়া আঙ্রাইল ও পুরন বনগাঁ অবস্থিত। পুরন বনগাঁ গ্রামের উত্তর সীমানা ধরিয়া ইছামতী নদী বনগাঁ শহরের দিকে গিয়াছে।

পুরন বনগাঁর কাছে ইছামতীকে ছাড়িয়া সীমানাটি দ্বিতীয়-বার ডাঙ্গা পথে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে (মানচিত্র ১৬)। এই অংশে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল। এক সময়ে এই সীমানাটি যে কোন না কোন নদীর তীর ধরিয়া টানা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; আন্তর্জাতিক সীমানার আশে পাশে নদীর পুরাতন খাত ও জলা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। পুরন বনগাঁর ২ মাইল উত্তরে পেত্রাপোল গ্রামে খুলনাগামী রেলপথটি, এবং

যশোর রোড সীমানারেখার দ্বারা কর্তিত হইয়াছে। উপরোক্ত গ্রামের উত্তর সীমানা ধরিয়া পূর্ববঙ্গের হকর নদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিবার পর ইছামতীর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আর একটু উত্তরে কোদালিয়া নদী পশ্চিম বঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে



মানচিত্র ১৬—খুলনাগামী রেল লাইনের উত্তরে ডাঙা-জমির উপরে আন্তর্জাতিক সীমানা

প্রবেশ করিয়াছে। জয়ন্তিপুর, পাইকপাড়া, রামচন্দ্রপুর, চড়ুইগাছি ও সুতিয়া—পশ্চিমবঙ্গের এই পাঁচটি গ্রাম হকর

ও কোদালিয়ার মধ্যবর্তী অংশে আন্তর্জাতিক সীমানা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কোদালিয়া নদীর মাত্র চার মাইল উত্তরে আর একটি নদী—বেতনা, সীমানা রেখা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এই নদীটি পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া গাঙ্গুলিয়া ও মুস্তাফাপুর গ্রামের গা ঘেঁসিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়াছে। গাঙ্গুলিয়া ও সুতিয়ার মধ্যে সীমানার নিকটে পশ্চিমবঙ্গের আর দুইটি গ্রাম--বাঙ্গলানি, ও বাঁশঘাটা অবস্থিত। মুস্তাফাপুর গ্রাম হইতে সীমানাটি আর আটটি গ্রামের—মালিদহ, বাজিৎপুর, কুরুলিয়া, মেহেরাণি, সারিপোতা, কুলানন্দপুর চক, সলক, কুলানন্দপুর—মধ্য দিয়া কপোতাক্ষী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। কুলানন্দপুর হইতে কপোতাক্ষী নদীর বর্তমান ও প্রাচীন খাত ধরিয়া সীমানাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া বয়রা গ্রামের উত্তর প্রান্তে গিয়াছে। সোজাপথে কুলানন্দপুর হইতে বয়রার দূরত্ব মাত্র ১½ মাইল, কিন্তু সীমানাটি নদীর তীর ধরিয়া যাওয়ায় এই অংশে ইহার দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ৭ মাইল। কপোতাক্ষীর বর্তমান খাত পরিত্যাগ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে আবার নূতন খাতে প্রবাহিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে; এবং তাহা হইলে সীমানা ঘটিত প্রশ্নও জটিল হইয়া উঠিতে পারে।

বয়রা গ্রাম হইতে আন্তর্জাতিক সীমানা তৃতীয়বার ডাঙ্গা পথে পশ্চিমদিকে ৩০ মাইল অগ্রসর হইয়া চর মণ্ডলভাগ গ্রামে ইছামতীর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বেতনা ও কোদালিয়া--এই দুইটি নদী পুনরায় এই অঞ্চলে সীমানারেখার দ্বারা কর্তিত হইয়াছে। কপোতাক্ষীর প্রায় ৯ ও ১৩ মাইল

পশ্চিমে যথাক্রমে বেতনা ও কোদালিয়া সীমানাকে ভেদ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। কপোতাক্ষী ও বেতনার মধ্যবর্তী অংশে সীমানা সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের সাতটি গ্রামের নাম—বয়রা, পাঁচবাড়িয়া, চরুইগাছি, পদ্মাপুকুরিয়া, মামা-ভাগিনা, মধ্যমপুর, মধুপুর। বেতনা ও কোদালিয়ার মধ্যে হরিহরপুর, ঝিকরা, জিৎপুর, কাশীপুর—এই চারটি গ্রামের উত্তর প্রান্ত ধরিয়া সীমানারেখাটি বিস্তৃত। সীমানা ধরিয়া বেতনা হইতে ইছামতীর দিকে অগ্রসর হইলে পশ্চিম-বঙ্গের আর আটটি ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়—রাজকোট, রঘুদেবপুর, কুলিয়া, রণঘাট, মাথাভাঙ্গা, পাথুরিয়া, পুষ্টিঘাটা, চরমণ্ডলভাগ। পূর্ব হইতে পশ্চিমে ডাঙ্গা পথে প্রসারিত আন্তর্জাতিক সীমানার উভয়পার্শ্বে প্রাচীন বহু নদীর কর্তিত অংশ ও জলা রহিয়াছে। এক সময় এখানেও যে একটি বেগবতী নদী পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রসারিত ছিল এবং তাহারই তীর ধরিয়া যে সীমানাটি টানা হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বঙ্গবিভাগের পূর্বে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গ্রামের, থানার বা জেলার সীমানা টানিবার সময় যে পরিমাণ যত্ন লওয়া হইয়াছিল, তাহার শতাংশের এক অংশও আন্তর্জাতিক সীমানা নির্দ্ধারণ করিবার সময় লওয়া হয় নাই। কাজেই, ভবিষ্যতে সীমানাগত বিরোধ উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং কোন প্রকার বিরোধ উঠিলে তাহার সত্বর মীমাংসার জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সীমা নির্দ্ধারণ ট্রাইবুন্যাল থাকা একান্ত আবশ্যক।

দশম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরী

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে ২৪ পরগণা জেলার পত্তন হয়, সে কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরাজের আমলে কলিকাতা গড়িয়া উঠিলেও আজ ইহা ভারতের অন্যান্য সমস্ত শহরকেই বহু বিষয়ে ছাড়াইয়া গিয়াছে। লোক-সংখ্যায় ভারতের শহরগুলির মধ্যে প্রথম স্থান, এশিয়া মহাদেশের শহরগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থান, এবং পৃথিবীর শহরগুলির মধ্যে পঞ্চদশ স্থান কলিকাতা অধিকার করিয়া রহিয়াছে।* ভৌগোলিক অবস্থানই ইহার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ। কলিকাতা গাঙ্গেয় উপত্যকার দ্বারস্বরূপ, কাজেই সমুদ্রপথে ভারতের সহিত বহির্জগতের বাণিজ্য ইংরাজের চেষ্টায় যতই প্রসারলাভ করিতে থাকে, ততই কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমেই কলিকাতা ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং ইহার আকর্ষণী শক্তি সম্যক বৃদ্ধি পায়। বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রধানত অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বহু লোক কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে, এবং কলিকাতার সহিত ভারতের অন্যান্য বাণিজ্য-প্রধান অঞ্চলের

* (১) নিউইয়র্ক, (২) লণ্ডন, (৩) টোকিয়ো, (৪) প্যারিস, (৫) শিকাগো, (৬) বার্লিন, (৭) মস্কো, (৮) সাংহাই, (৯) ওসাকা, (১০) লেনিনগ্রাড, (১১) ফিলাডেলফিয়া, (১২) বোয়েনাস্ আইরিস্, (১৩) লসএঞ্জেলস্, (১৪) বোষ্টন, (১৫) কলিকাতা।

যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বর্তমানে শুধু বাংলার রাজধানী বলিয়া নহে, বাঙ্গালীর যাহা কিছু নিজস্ব তাহা কলিকাতাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে বলিয়া বাঙ্গালীর কাছে কলিকাতার এত আদর। বাঙ্গালীর প্রাণ কলিকাতা শহরের আকাশে, বাতাসে ও প্রতি ধূলিকণায় মিশিয়া রহিয়াছে। এই শহরেই বাঙ্গালীর চিন্তাধারা রূপ গ্রহণ করিয়া ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া যায়, এবং ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে সহায়তা করে। কলিকাতা প্রধানত ইংরাজের দান হইলেও, বাঙ্গালীর আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই আজ ইহা বিশ্বের দরবারে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অবস্থান ও আয়তন

কলিকাতা মহানগরী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। গঙ্গার মোহানা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৯০ মাইল হইলেও সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দরে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিয়া থাকে। ভারতের উপকূলে কলিকাতার মত এত বড় বন্দর নাই। কাজেই, ভারতের সহিত, বিশেষ করিয়া পূর্ব ও উত্তর ভারতের সহিত, সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে হইলে প্রত্যেক দেশকে কলিকাতার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহা না হইলে কলিকাতা আজ এত বড় শহর হইতে পারিত না। লণ্ডনের মত কলিকাতা একটি শহর নহে; ইহা কয়েকটি শহরের সমষ্টি। সেই জন্যই কলিকাতাকে শহুরে জেলা বলা চলিতে পারে। উত্তরে কাশীপুর (২২°৩৮′ উত্তর

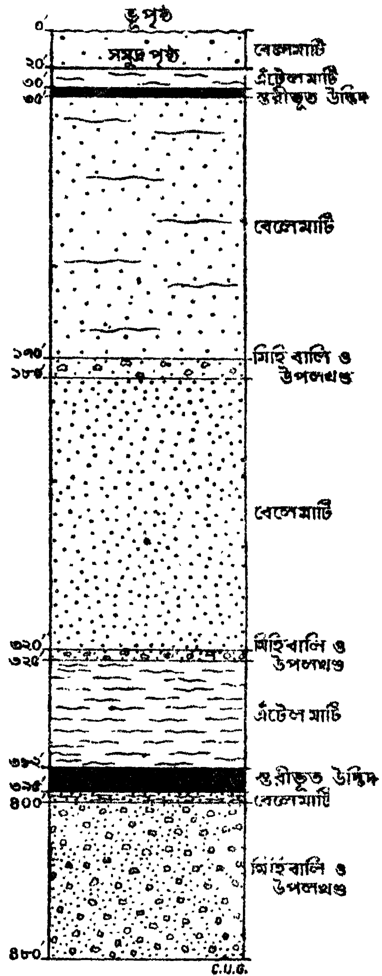
অক্ষরেখা) হইতে দক্ষিণে কালীঘাট (২২°৩০½′ উত্তর অক্ষরেখা) এবং পশ্চিমে খিদিরপুর (৮৮°১৮′ পূর্ব দ্রাঘিমা) হইতে পূর্বে বেলেঘাটা (৮৮°২৪½′ পূর্ব দ্রাঘিমা) পর্যন্ত কলিকাতা জেলা বিস্তৃত (মানচিত্র ১৭)। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা এবং পরপারে অবস্থিত হাওড়া শহরও কলিকাতারই অংশবিশেষ। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের (কলিকাতা করপোরেশন) অন্তর্ভুক্ত এলাকার আয়তন ২৮·৩ বর্গমাইল। উহার সহিত ফোর্ট উইলিয়াম ও ময়দানের, এবং পোর্ট ও খালের আয়তন যোগ করিলে কলিকাতা জেলার আয়তন দাঁড়ায় ৩৩·৭ বর্গমাইল। কলিকাতার দক্ষিণস্থ তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি—গার্ডেনরীচ (৩·৪ বর্গমাইল) সাউথ সুবার্বন (১২·২ বর্গমাইল) ও টালীগঞ্জের (৬·৬ বর্গমাইল) এবং পশ্চিমস্থ হাওড়া শহরকে (১০·১ বর্গমাইল) কলিকাতার শহরতলী বলিয়া ধরিলে, কলিকাতা ও শহরতলীর আয়তন দাঁড়ায় ৬৬ বর্গমাইল। খাস কলিকাতা প্রেসিডেন্সি টাউন নামে পরিচিত; ইহার উত্তরে বাগবাজার রোড, পূর্বে আপার ও লোয়ার সার্কুলার রোড, দক্ষিণে লোয়ার সার্কুলার রোড ও আদি গঙ্গা এবং পশ্চিমে গঙ্গা রহিয়াছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি টাউনের আয়তন প্রায় ৮ বর্গমাইল (মানচিত্র ১৭)।

কলিকাতার ভূ-প্রকৃতি

গঙ্গার তীরবর্তী জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং শহর নির্মাণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গড়ের মাঠের পশ্চিম প্রান্তে

নেপিয়ার প্রস্তর মূর্তির কাছে একটি বেঞ্চমার্কে লেখা আছে যে, কলিকাতার ঐ অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২০ ফুট উঁচু। প্রাচীন কালীক্ষেত্র এই অংশের মধ্য দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত ছিল। গঙ্গার তীরভূমি পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ধীরে ধীরে ঢালু হইয়া এক নীচু জলাভূমির সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বহু দিন পূর্বে এই বিলগুলি আরও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল; তখন কয়েকটি খাল গঙ্গার তীর হইতে উঠিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইত, এবং উপরোক্ত বিলগুলির মধ্যে আসিয়া পড়িত। এখন যেখানে শিয়ালদহ ষ্টেসন, পূর্বে সেখান একটি ছোট দ্বীপ চারিদিকের জলার উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল; শিয়ালদহ ষ্টেসনের কাছেও ২০ ফুট উচ্চতা লেখা একটি বেঞ্চমার্ক আছে। এখন জলাগুলি সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সরিয়া গিয়াছে; ফলে ঐ দিকে লোকের বসবাস সম্ভবপর হইয়াছে। চিৎপুরের খাল ছাড়া অন্যান্য খালগুলিকে বুঁজাইয়া দিয়া উহাদের উপর পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। অধুনা শিয়ালদহ ষ্টেসনের কাছে যে রাস্তাটি ক্রীকরো নামে পরিচিত, বহু দিন পর্যন্ত সেই স্থান দিয়া একটি ক্রীক বা খাল প্রবাহিত হইত। লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা প্যারিস শহরের মত কলিকাতা খুব সুদৃঢ় মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ফলে এখানে ভূগর্ভস্থ ট্রেণ বা বহু তলার বাড়ী নির্মাণ করা একরকম অসম্ভব বলিলেই হয়। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া ময়দানে, পুষ্করিণী খনন করিবার সময় চার বা পাঁচ ফুট মাটির নীচে মৃত সুঁদরী

গাছকে সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। জমির ব্যাপকভাবে বসিয়া যাওয়ার ফলেই গাছগুলির আজ এই অবস্থা হইয়াছে। ঐ একই কারণে কলিকাতার বড় বড় অট্টালিকার ছাদ বা দেয়াল প্রায়ই ফাটিয়া যায়। কলিকাতার ভূগর্ভস্থ মাটির স্তর গুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহারা সমুদ্র গর্ভে সঞ্চিত হয় নাই। কাজেই, কলিকাতাকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশ বলা চলে না। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে প্রায় ৫০০ ফুট গভীর কুয়া খনন করি- ৬১৩
বার সময় এমন কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয় যে, কলিকাতা অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ অন্তত ৫০০ ফুট



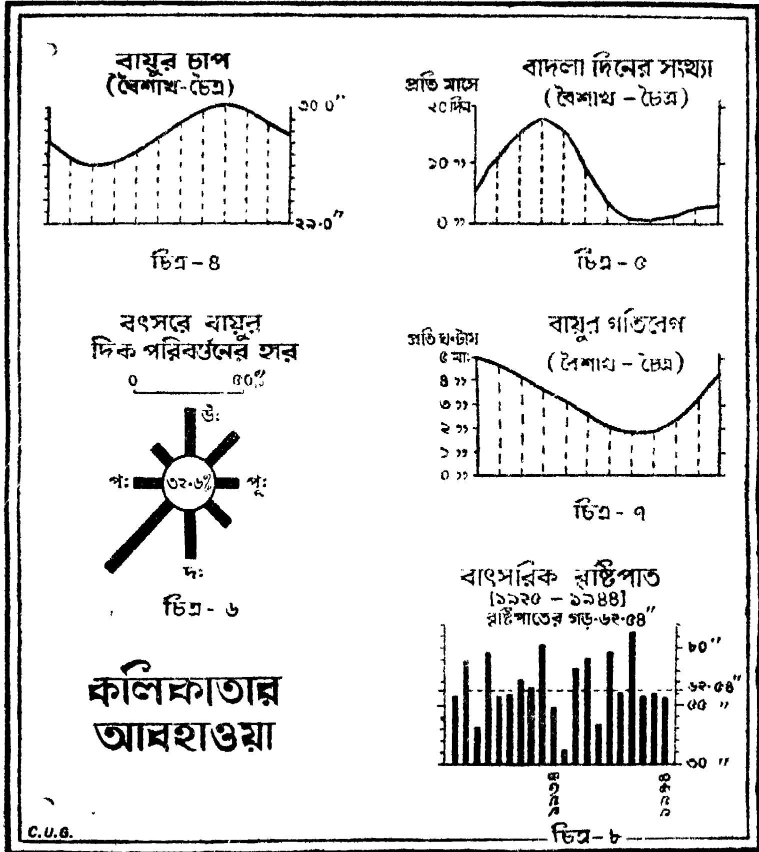
চিত্র ৩—কলিকাতার ভূ-গঠন

নীচে ধীরে ধীরে বসিয়া গিয়াছে। ৩নং চিত্রে কলিকাতার ভূ-পৃষ্ঠের ৩০ ফুট ও ৩৮২ ফুট নীচে রূপান্তরিত কাঠের (Peat) দুইটি স্তর, এবং ১৭০ ফুট, ৩২০ ফুট ও ৪০০ ফুট নীচে মিহি বালি ও পাথরের নুড়ী দেখান হইয়াছে। ঐ প্রকার রূপান্তরিত কাঠ, মিহিবালি ও উপলখণ্ড একমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের উপরেই সঞ্চিত হইতে পারে, কাজেই ইহারা পূর্বতন ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশবিশেষ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে অঞ্চলে কলিকাতা শহরটি আজ গড়িয়া উঠিয়াছে, অতীতে সেই অঞ্চলটি একটি প্রাচীন সমুদ্রোপকূল ছিল। উহার সন্নিকটেই প্রস্তরময় কোন পাহাড় বা মালভূমি থাকায়, প্রাচীন নদীগুলি সহজেই পাথরের টুকরা আহরণ করিতে পারিত। ঐ পাথরের টুকরা গুলি পাথরের নুড়ী-রূপে মাটির নীচে আজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতার আবহাওয়া

এই শহরের আবহাওয়া বড়ই পরিবর্তনশীল। শীতকালে হঠাৎ কোন দিন বেশ গরম অনুভূত হয়, এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ঝড় উঠিয়া শীতের দিনের কথা মনে করাইয়া দেয়। অসময়ে বৃষ্টি এবং বর্ষাকালে শুকনো খট্‌খটে ভাব অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার মূল উপাদান—বৃষ্টি ও তাপ; এ সম্বন্ধে বহু কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) বায়ুর চাপের পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। কলিকাতায় আষাঢ় মাসে

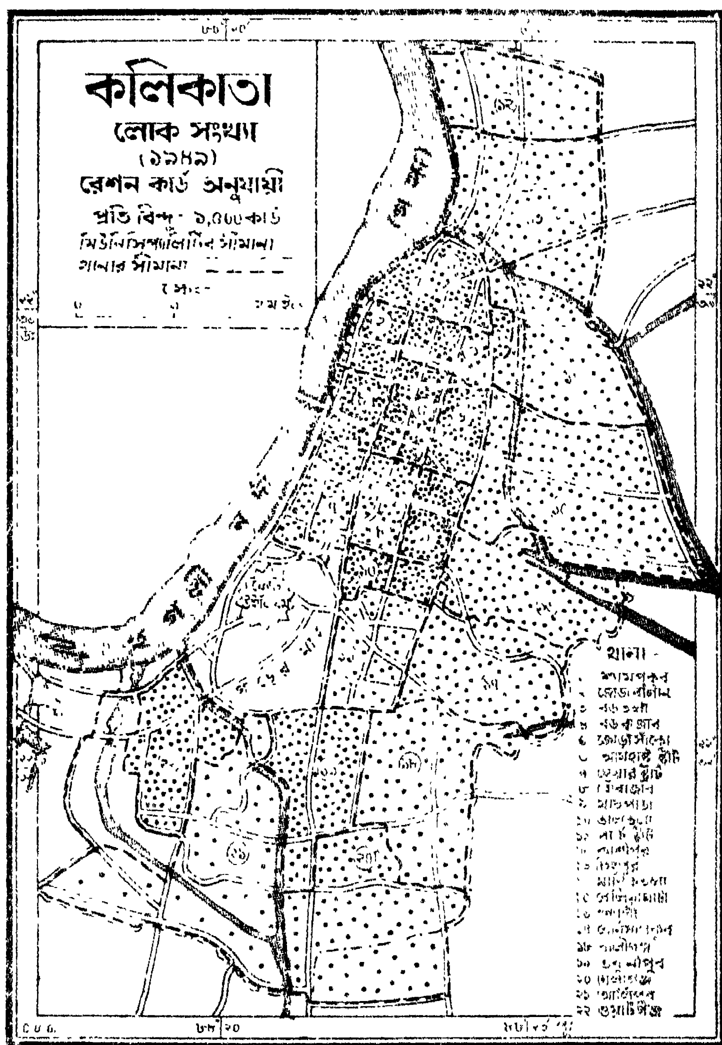
বায়ুর চাপ সব চেয়ে কম, এবং সেই মাসেই বাদলা দিনের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হয়; ক্রমেই চাপ বাড়িতে বাড়িতে



চিত্র ৪, ৫, ৬, ৭, ৮—কলিকাতার বায়ু ও বৃষ্টি

পৌষমাসে সব চেয়ে বেশী হয়, ফলে সেই মাসটি খটখটে শুকনো; পৌষ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত বায়ুর চাপের সঙ্গে সঙ্গে

বাদলা দিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৪, ৫)। কলিকাতায় প্রতি বৎসর শতকরা কতবার বাতাস কোন দিক হইতে আসিতেছে তাহা ৬ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। কলিকাতায় বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম হইতেই বেশীর ভাগ আসে, এবং ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা বাড়ী সব চেয়ে বেশী আরামদায়ক। দক্ষিণ-পশ্চিমের পরেই সোজা দক্ষিণ খোলা বাড়ীর আদর। শীতকালে উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আসার জন্য বাড়ীর উত্তর দিক খোলা থাকিলে কোন অসুবিধাই হয় না। পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে বেশী বায়ু প্রবাহিত হয় না, তবে পূর্ব-খোলা বাড়ীতে সূর্যের প্রথম কিরণ প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালীন বৈকালের দিকের ঝড়কে কেন কালবৈশাখী বলে তাহা ৭নং চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই মাসেই বায়ুর গতি সবচেয়ে বেশী। বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বায়ুর গতিবেগ ক্রমেই কমিতে থাকে, এবং শীতকালে একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে। কলিকাতায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ ৬২·৫৪ ইঞ্চি, তবে কোন কোন বৎসর ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, এবং সেই সেই বৎসর কলিকাতার অধিবাসীদের কষ্টের অবধি থাকে না। বৃষ্টির জল বাহির করিবার ভাল ব্যবস্থা না থাকায় কলিকাতার বহু রাস্তা জলে জলময় হইয়া যায় ; এ বিষয়ে ঠন্‌ঠনে অঞ্চল কুখ্যাত। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, এই কুড়ি বৎসরের বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ছয়বার, ৭০ ইঞ্চিরও বেশী বৃষ্টি হইয়াছিল (চিত্র নং ৮)।



মানচিত্র ১৮—কলিকাতার লোকসংখ্যা (১৯৪৯)

লোকের বসবাস ও উপজীবিকা

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪৯ সাল) কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এলাকার লোক সংখ্যা ৩০,৭২,৩৯৯। ১৯৪১ সালের আদম স্নুমারীর গণনায় এই অঞ্চলের লোক সংখ্যা ছিল ২০,৭০,৬১০। গত আট বৎসরে খাস কলিকাতার লোক সংখ্যা দশ লক্ষের বেশী বৃদ্ধি পাইলেও, সেই অনুপাতে শহর বাসের সুখ সুবিধা কিছুই বাড়ে নাই। ফলে, কলিকাতায় বহু লোক স্থানাভাবে ফুটপাথের উপর শুইয়া রাত কাটাইয়া দেয়, এবং যানবাহনের অভাবের জন্য ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড় হয়। কলিকাতার কোথায় কত লোক বাস করিতেছে তাহা ১৮নং মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। উত্তর কলিকাতা যেন জনসমুদ্র ; এখানকায় ছয়টি থানায়—শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, বড়তলা, বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট-প্রায় ৮½ লক্ষ লোক বাস করে। মধ্য কলিকাতার তিনটি থানায়—বৌবাজার, মুচিপাড়া ও তালতলায় আরও ৩½ লক্ষ লোক বাস করে। লোয়ার চিৎপুর-বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ও তাহার পশ্চিমে কিঞ্চিদধিক ১ লক্ষ বাঙ্গালী ও বিশেষ করিয়া অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এবং তাহাদের কর্ম্মচারীরা হেয়ার ষ্ট্রীট থানার এলাকায় বাস করে। দক্ষিণ কলিকাতায় ভবানীপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানায় লোকের বাস সব চেয়ে বেশী—প্রায় ৪ লক্ষ। কলিকাতার অন্যান্য শহর তলীতে অপেক্ষাকৃত কম লোক বাস করে। এই অঞ্চলের সম্যক উন্নয়ন হইলে বহু লোক খাস কলিকাতা হইতে সরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত জনবিরল শহরতলীতে বসবাস করিতে পারে।

কলিকাতার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা তিনটি—(১) ব্যবসায়, (২) কলকারখানায় শ্রমিকগিরি, এবং (৩) লোকের বাড়ী দাস্যবৃত্তি। যাহারা কলিকাতায় অর্থ উপার্জন করে, তাহাদের প্রায় অর্ধেক এই তিনটি কার্যে নিযুক্ত আছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সাধারণত শিক্ষকতা, ওকালতি ও চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত। ইহাদের সংখ্যা এবং যাহারা যানবাহন পরিচালনায় নিযুক্ত তাহাদের সংখ্যা, প্রায় সমান। একমাত্র কলিকাতাবন্দরে বৎসরে প্রায় এক কোটি টন ওজনের জিনিষ-পত্র জাহাজে ওঠান-নামান হয়, এবং সেজন্য বহু শ্রমিকের আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৭৪টি কলেজের মধ্যে ৩৪টি কলিকাতাতেই আছে, এবং মাত্র পাঁচটি কলেজের—বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ (পূর্বতন রিপন), সিটি, বঙ্গবাসী ও আশুতোষ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩০ হাজারেরও উপর। এছাড়া প্রায় দেড়শত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে প্রায় আড়াই শত প্রাইমারী স্কুল আছে। এই সকল স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করিবার জন্য বহু শিক্ষকের প্রয়োজন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হইলেও, কলিকাতার গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই ইহার মূল কারণ। সমুদ্র হইতে জাহাজ

কোটি কোটি টাকা মূল্যের মাল লইয়া আসে, এবং ফিরিয়া যাইবার সময় আবার জাহাজ ভরিয়া মাল লইয়া যায়। এইসব মালপত্রের লেনদেনের জন্য কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায়

কলিকাতা বন্দর
(আমদানী)
[১৯৩৮ - ৩৯] [১৯৪৬ - ৪৭]
কোটী টাকা ৫ ২.৫ 0 | 0 ২.৫ ৫ কোটী টাকা
যন্ত্রপাতি
খনিজ তৈল
কাটা কাপড়
খনিজ ধাতু
লৌহ ও ইস্পাত
খাদ্য শস্য
মসলা
রাসায়নিক দ্রব্য
পশমী দ্রব্য
ঔষধপত্র
তামাকজাত দ্রব্য
মদ্য
লবণ

চিত্র ৯—মূল্য অনুযায়ী প্রথম কয়টি আমদানী দ্রব্য

প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ৯ ও ১০নং চিত্রে কলিকাতা বন্দরে প্রধান প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানির মূল্য দেখান হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে, ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে, কিঞ্চিদধিক ৪৮ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী এবং প্রায় ৭১ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয়। যুদ্ধ শেষে, এখন (১৯৪৬-৪৭ খৃঃ অঃ) তাহা বাড়িয়া আমদানীর মূল্য অন্তত ৭০ কোটি টাকা এবং রপ্তানির

মূল্য ১৮৫ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে আমদানা দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল এবং সূতীবস্ত্র মূল্য অনুপাতে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখন খনিজ তৈল, খনিজ ধাতু ও খাদ্যশস্য প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়াছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে

কলিকাতা বন্দর

[১৯৩৮-৩৯] (রপ্তানি) [১৯৪৬-৪৭]

কোটী টাকা ২৫ 0 | 0 ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০ কোটী টাকা

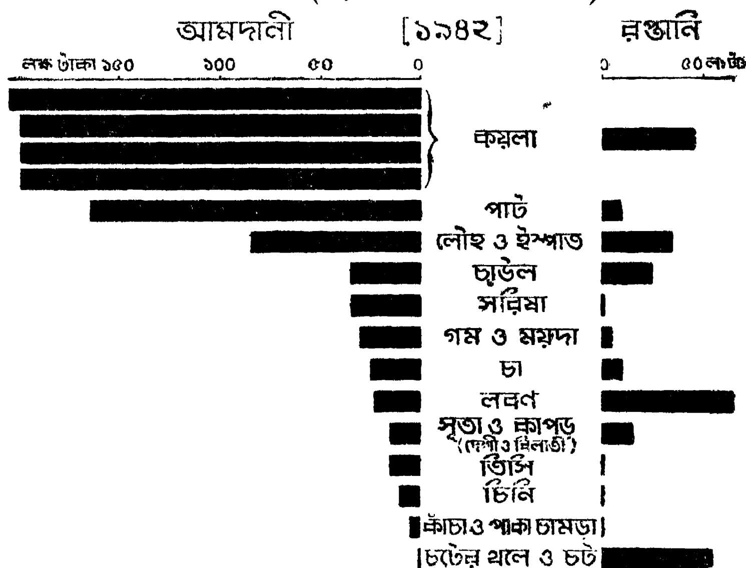
পাট
চা
লাক্ষা
চামড়া
অভ্র
পশমী দ্রব্য
চর্ম্মজাত দ্রব্য
শস্য
কয়লা
খাদ্যশস্য
লৌহ ও ইস্পাত
খনিজ ধাতু

চিত্র ১০—মূল্য অনুপাতে প্রথম কয়টি রপ্তানি দ্রব্য

মূল্য অনুপাতে পাট ও চা যুদ্ধের পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং এখনও তাহাই আছে, তবে আরও অধিক মূল্যের পাট ও চা যুদ্ধশেষের পর হইতে রপ্তানি হইতেছে। লণ্ডনের পরিবর্তে এখন কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে আন্তর্জাতিক চা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইতে

১০

চলিয়াছে। রেল ও নদীপথে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি কলিকাতায় আমদানী এবং কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে (চিত্র নং ১১)। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে কয়লাই প্রধান, কারণ কলিকাতা ও সন্নিহিত শিল্প-প্রধান অঞ্চলে কয়লার চাহিদা



চিত্র ১১—রেল ও নদীপথে কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তানি (১৯৪২)।

খুব বেশী। ১৯৪২ সালে ৮ কোটি টাকা মূল্যের কয়লা রেলপথে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং সেই বৎসর রেল ও নদীপথে ১৺ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা পাট আসে। রেল ও নদীপথে কলিকাতায় আমদানী অপেক্ষা কলিকাতা হইতে রপ্তানি খুব

কম। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চটের থলে ও চট, এবং লবণই প্রধান। কলিকাতার ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স প্রধান। অন্যান্য ব্যবসায়ী সঙ্ঘের মধ্যে কলিকাতা ট্রেডস্ অ্যাসোসিয়েসন, বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স ও ভারতীয় চেম্বার্স অব কমার্স উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার বেসরকারী জন-হিতকর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন ও কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী প্রধান। কলিকাতার রাস্তায় অধিকাংশ বেসরকারী বাসগুলির পরিচালনার ভার বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের হাতে ন্যস্ত আছে।

কারিগরী শিল্প

কলিকাতা ভারতের প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরে মূলধনের প্রাচুর্য দেখা দিল, এবং প্রধানত স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোকের চাহিদা মিটাইবার জন্য শহরে ও শহরতলী অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী শিল্প গড়িয়া উঠিল; এবং ক্রমেই কলিকাতার উৎপন্ন বহু দ্রব্য দেশে বিদেশে রপ্তানি হইতে লাগিল। কলিকাতায় যন্ত্রশিল্প ও কুটীর শিল্প দুইই দেখা যায়। যন্ত্র শিল্পের মধ্যে শহরতলী অঞ্চলে অবস্থিত চটকল, পাটকল, কাপড়ের কল, চালের, ময়দার ও তেলের কল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি নির্মাণের কারখানা, আগ্নেয় অস্ত্র নির্মাণের কারখানা, সাবান, দিয়াশলাই প্রভৃতি নিত্য

প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণের কারখানা, এবং শহরের মধ্যে অবস্থিত ছাপাখানা, মোটর মেরামতির ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রধান। কলিকাতায় যত ছাপাখানা আছে ভারতের আর কোন শহরে তত নাই। কলিকাতার ছাপাখানায় ছাপিয়া বহু পুস্তক বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কলিকাতার বিভিন্ন যন্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এক লক্ষের উপর। কুটীর শিল্পের মধ্যে কামার শালা, জুতা তৈয়ারী ও বিড়ি তৈয়ারীর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। ফুটপাথের ধারে কোন রকমে একটু স্থান করিতে পারিলে কয়েকজন মিলিয়া হয় বিড়ি আর না হয় জুতা তৈয়ারী করিতেছে, উত্তর ও মধ্য কলিকাতায় এ দৃশ্য খুবই সাধারণ।

যানবাহন

অন্যান্য বড় বড় শহরের মত কলিকাতার রাজপথে ইলেকট্রিক ট্রাম ও মোটর বাস যাত্রী বহন করিয়া নিয়মিতরূপে চলাচল করে। কলিকাতার নূতন ট্রামগাড়ীর মত এত সুন্দর গাড়ী পৃথিবীর খুব কম শহরেই দেখা যায়। কলিকাতায় ট্রাম গাড়ী প্রথম পনের বৎসর ঘোড়ায় টানিত, এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা ইহা চালিত হইতেছে। কলিকাতা ও শহরতলীর ৪০০ মাইল লম্বা রাস্তার উপর ৮৪ মাইল ট্রাম লাইন পাতা হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া দৈনিক ৪৬১ ট্রাম গাড়ী চলাচল করিয়া বৎসরে প্রায় ৩২ কোটি যাত্রী

বহন করে। লণ্ডন ও প্যারিসের ট্রাম গাড়ীর বৈদ্যুতিক তার যেমন মাটির নীচ দিয়া গিয়াছে, এখানেও তাহা করিতে পারিলে বহু অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের অন্তর্ভুক্ত বেসরকারী যাত্রীবাহী মোটর বাসের সংখ্যা ৫১২; ইহারা মোট ১১০ মাইল লম্বা বিভিন্ন রাজপথ দিয়া চলিয়া বৎসরে আরও ১২ কোটি যাত্রী বহন করে। লণ্ডন ও প্যারিসের মত কলিকাতায় রেল লাইন-গুলি চক্রাকারে শহরকে বেষ্টন করিয়া নাই; রেল ষ্টেসনগুলির—শিয়ালদহ, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার ও কালীঘাট, এবং গঙ্গার অপর পারে হাওড়া ও কদমতলা—প্রত্যেকটি শহরের প্রান্ত দেশে অবস্থিত। ফলে, কলিকাতার আশপাশ হইতে আগত অসংখ্য ডেলীপ্যাসেঞ্জারদেরও ট্রামে ও বাসে চড়িয়া শহরের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত কর্মস্থলে যাতায়াত করিতে হয়। এই শহরের ট্রামে ও বাসে অসম্ভব ভাড়ের ইহাও অন্যতম কারণ। জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ১৩৫টি বাস কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে চালু করিয়াছেন, ইহারাও প্রতিমাসে ৩০ লক্ষ যাত্রী বহন করে। কলিকাতায় মোটর ট্যাক্সির সংখ্যা ১,২০০; এত বড় শহরের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে বহু ঘোড়ার গাড়ী এখনও দেখা যায়, তবে ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে; রেলযাত্রীর মাল পত্র বহন করিবার পক্ষে ইহারা বিশেষ উপযোগী। মানুষ টানা রিক্সা উত্তর কলিকাতায় অলিতে গলিতে দেখা যায়; সাধারণত

পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলিতে বাস কম চলে বলিয়া রিক্সার প্রচলন বেশী। বড় বাজার অঞ্চলে, ষ্ট্রাণ্ড রোডে এবং শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনের পথে মাল বোঝাই করিয়া বহু ঠেলাগাড়ী মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। মনুষ্য শক্তির এরূপ অপব্যবহার একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভবপর। মালপত্র বহন করিবার জন্য মোটর লরী এবং গরু বা মোষের গাড়ী যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। গঙ্গার ঘাটে পারাপারের জন্য ছোট ছোট বহু নৌকা ও পোর্ট ট্রাষ্টের কয়েকটি ষ্টীমার নিযুক্ত আছে; কলিকাতার চাঁদপালঘাট হইতে বহু যাত্রী অপর পারে অবস্থিত রামকৃষ্ণপুর ঘাটে, শিবপুর ঘাটে ও তেলকল ঘাটে ষ্টীমারে যাতায়াত করে। কলিকাতার লোক সংখ্যা যে ভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভূগর্ভস্থ ইলেকট্রিক ট্রেণের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কলিকাতার অধিবাসীদের যাতায়াতের কষ্ট মোচন হইবে না। প্যারিসে রাত্রিকালে ট্রাম বন্ধ হইয়া গেলে ট্রাম লাইনের উপর দিয়া ষ্টীম এঞ্জিন দ্বারা চালিত মালগাড়ী শহরের বিভিন্ন স্থানে যেমন যাতায়াত করে, কলিকাতাতেও সেরূপ করিতে পারিলে রাত্রিকালে অনায়াসে মালপত্র সরাসরি করা যাইতে পারে, এবং দিনের বেলায় ট্রাম বাস অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে চলাফেরা করিতে পারিবে।

শহরের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন অঞ্চল

লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও মস্কোর মত কলিকাতা শহরও নদীর এক তীরে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ইউরোপীয়



ফটোচিত্র ৫১— গঙ্গা ঃ কলিকাতার সদর দরজা
[গঙ্গার উপর নূতন পুল এবং হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষমান যানবাহন ।]
(পৃষ্ঠা ১৫১)



ফটোচিত্র ৫২—সার্কুলার খাল ঃ কলিকাতার খিড়কী দরজা
[খালের উপর মালবোঝাই নৌকা ।] (পৃষ্ঠা ১৫৩)



ফটোচিত্র ৫৩—আপার চিৎপুর রোডঃ কলিকাতার প্রথম রাস্তা
[ট্রামটি চিৎপুর রোডের উপর; ডানদিকে বি, কে, পাল এভিনিউ।] (পৃষ্ঠা ১৫৯)

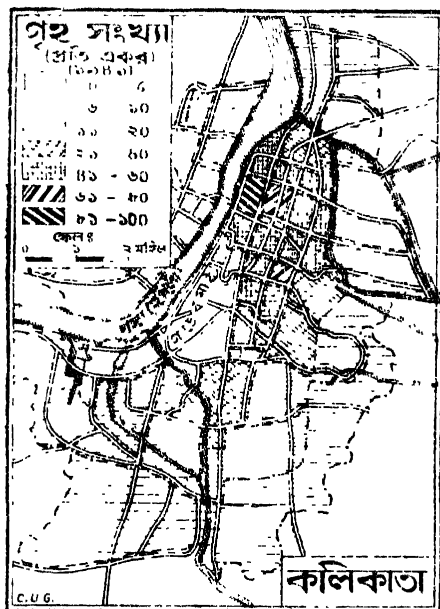


ফটোচিত্র ৫৪—কলেজ ষ্ট্রীট : কলিকাতার প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র
[বৃষ্টির জলে প্লাবিত রাস্তায় যানবাহন চলাচলের অসুবিধা।] (পৃষ্ঠা ১৬২)

রাজধানীগুলির মত কলিকাতা নদীর উভয় পার্শ্বে পরে চক্রাকারে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পায় নাই। প্রশস্ত গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ প্রথমে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত। মাত্র ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ভাসমান নৌকার সাহায্য লইয়া গঙ্গার উপর প্রথম সেতু নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু নীচ দিয়া জাহাজ চলাচলের পথ করিয়া দিবার জন্য সেতুটির মাঝখান প্রায়ই খোলা হইত, এবং তাহার ফলে হাওড়া ও কলিকাতার মধ্যে সকল সময় পুলের উপর দিয়া মোটর, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনাদির চলাচল সম্ভবপর ছিল না। গঙ্গার পশ্চিম পারে হাওড়া অপেক্ষা পূর্ব পারে কলিকাতার সন্নিহিত শহরতলীতে বসবাস করা লোকেরা কেন শ্রেয় মনে করিত, ইহা তাহার অন্যতম কারণ। এখন অবশ্য ভাসমান সেতুর পরিবর্তে প্রায় ৩½ কোটি টাকা অর্থব্যয় করিয়া পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়-বৃহত্তম ঝুলান সেতু নির্মাণ করা হইয়াছে; এবং ফলে হাওড়া বালীগঞ্জের মত এক সুন্দর শহরতলীতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

গঙ্গাকে যদি কলিকাতার সদর দ্বার বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে উত্তর ও পূর্বদিকে প্রবাহিত চিৎপুরের খাল বা সার্কুলার ক্যানালকে কলিকাতার খিড়কী দরজা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই পথে মালবাহী অসংখ্য নৌকা নিয়মিতরূপে যাতায়াত করে। পশ্চিমে গঙ্গা, এবং উত্তরে ও পূর্বে খাল বা নোনা হ্রদ কলিকাতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখায়, সম্ভবপর মাত্র একটি দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে কলিকাতার প্রধান শহরতলী

ভবানীপুর-কালীঘাট-বালীগঞ্জ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, এবং কলিকাতার আকার লম্বাটে হইয়া যায়। উত্তর হইতে দক্ষিণে লম্বভাবে প্রসারিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই যে কলিকাতার



চিত্র ১৯—কলিকাতার গৃহসংখ্যা

অধিকাংশ বাড়ী কেন্দ্রীভূত, তাহা ১৯নং মানচিত্র দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ আকারের এত বড় শহর পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না; এবং লম্বভাবে বিস্তৃত শহরে এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যোগাযোগ রাখা যে সহজ ব্যাপার নহে, তাহা কলিকাতার অধিবাসীরা আজ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে। কলিকাতার একদিকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সকালে ও বিকালে মন্থর গতিতে যান-

বাহনের চলাচলের এবং ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড়ের অন্যতম কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কলিকাতাকে আটটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) খালপার, (২) উত্তর কলিকাতা, (৩) লালদীঘি অঞ্চল, (৪) মধ্য কলিকাতা, (৫) চৌরঙ্গী, (৬) গড়ের মাঠ বা ময়দান, (৭) দক্ষিণ কলিকাতা, (৮) কলিকাতার বন্দর। প্রত্যেক অঞ্চলেরই আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) খালপার

খাস কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব দিকে খালপার অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলটি উত্তরে সিঁথী হইতে দক্ষিণে বেলেঘাটা খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমদিকে গঙ্গা ও সার্কুলার খাল (কেনাল), এবং পূর্বদিকে একটি প্রধান রেল লাইন ও নূতন খাল রহিয়াছে। দেশবন্ধু পার্কের নিকট সার্কুলার খাল হইতে আর একটি খাল কাটিয়া (নূতন খাল) কৃষ্ণপুর খালের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে সার্কুলার খাল বেলেঘাটা খালের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এবং শেষোক্ত খালটি প্রায় দুই মাইল পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ার পর চিংড়িঘাটা থানার নিকটে উত্তর হইতে আগত নূতন খালের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সার্কুলার খালের উপর বিভিন্ন স্থানে সাতটি পুল থাকায় হাঁটাপথে খাস কলিকাতা হইতে উত্তরে কাশীপুর, চিৎপুর, সিঁথী, সাতপুকুর, পাইকপাড়া,

টালা ও বেলগাছিয়া, এবং পূর্বে উল্টাডাঙ্গা, মাণিকতলা, নারিকেলডাঙ্গা, কাঁকুরগাছি, বেলেঘাটা, সুড়ো ও কুলিয়া সহজেই কলিকাতার সহিত যুক্ত হইয়া কলিকাতার শহরতলী-রূপে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু এখনও খাল পার হইলেই কলিকাতার এক ভিন্ন রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে খোলা ড্রেণ, কাঁচা বাড়ী, জলে ও আগাছায় ভরা মাঠ—এই অঞ্চলকে শ্রীহীন করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য ইতস্তত পাকা বাড়ী ও কলকারখানা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। উত্তর দিক হইতে নদী দিয়া কলিকাতা প্রবেশের মুখে গাছপালায় ঢাকা সুন্দর সুন্দর বাড়ী ও মন্দির, এবং একটু পরেই একটির পর একটি কলকারখানা দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। গঙ্গার তীরে উল্লেখযোগ্য প্রথম কারখানা—কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই করপোরেশনের কাশীপুরস্থিত পাওয়ার ষ্টেসন, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার সন্নিকটেই ভারত গভর্ণমেণ্টের বিখ্যাত কাশীপুরের বন্দুক ও গোলাবারুদ নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলার ২৩টি পাটকলের (জুট প্রেস) মধ্যে ১৪টি এই অঞ্চলে কাশীপুর রোডের পশ্চিমে অবস্থিত। এই পাটকলগুলিতে নিযুক্ত প্রায় সাত হাজার শ্রমিকের অধিকাংশই যে অবাঙ্গালী, ইহা তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা প্রণালী দেখিলেই বোঝা যায়। সার্কুলার খাল যেখানে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে খালের উপর একটি ঝুলান সেতু আছে; এই সেতুর উপর দিয়া কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের বড় মাপের

রেল লাইন উত্তরে কাশীপুর ঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার তলা দিয়া যাহাতে বড় বড় নৌকা খালের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সেজন্য সেতুটির মাঝখানে খুলিয়া উপরে উঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত আছে। খালের একটু উত্তরে গঙ্গার ধারে রেলের একটি প্রধান জেটি অবস্থিত, এবং ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের (পূর্বতন ইস্টবেঙ্গল বা বেঙ্গল আসাম রেল) প্রধান রেলের সহিত যুক্ত, কাজেই, ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে মাল বোঝাই করা মালগাড়ী এই পথ দিয়া সোজা বন্দরে প্রবেশ করিয়া একেবারে জাহাজের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। হাঁটা-পথে উত্তর দিক হইতে কলিকাতায় প্রবেশের সবচেয়ে বড় ও সুন্দর রাজপথ—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড, এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা এবং ইহার পশ্চিমে অবস্থিত কাশীপুর রোড দিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে যাওয়া যায়। বারাকপুর ট্রাঙ্করোডের দক্ষিণাংশের একপার্শ্বে অসংখ্য লৌহ স্তম্ভের উপর অবস্থিত টালার জলের ট্যাঙ্ক বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই জলাধারের গভীরতা ১৬ ফুট এবং আয়তন ৩২১ বর্গ ফুট, ভূপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১১০ ফুট; ইহাতে প্রায় ৯০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এতবড় এই প্রকার জলাধার নাই। টালার পাম্পিং ষ্টেশনের চিমনিটি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের প্রায় শেষ দক্ষিণ প্রান্ত হইতেও সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। টালা পার্কের একটু দক্ষিণে আর একটি প্রধান রাজপথ—বেলগাছিয়া রোড, পূর্বাভিমুখে গিয়া যশোর রোড নামে

পরিচিত হইয়াছে। বেলগাছিয়া রোড দিয়া রেলের পুল পার হইয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার সময় রাস্তার বামদিকে একটি সুন্দর দিগম্বর জৈন মন্দির ও তৎসংলগ্ন মনোরম উদ্যান দেখা যায়; আরও একটু অগ্রসর হইলে রাস্তার বামদিকে বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো এবং ডানদিকে বারাসাত-বসিরহাট ছোট মাপের রেল লাইনের প্রথম ষ্টেসন, শ্যামবাজার দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্গ-বিভাগের পর এই রাস্তা ও রেলপথটির সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বেলগাছিয়া রোডের উপর একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং একটি ভেটারিনারী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়া এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ প্রভৃতি বহু উড়োজাহাজ কোম্পানীর বিশেষ ধরণের বাস যাত্রী লইয়া দমদমের এরোড্রোমে যাতায়াত করে। যশোর রোড দিয়া রেল লাইনের নিকটে কলিকাতার সীমানা ছাড়াইয়া আরও তিন মাইল অগ্রসর হইলে দমদম এরোড্রোম দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে ভারতের তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে উড়োজাহাজে যাওয়া যায়। এই এরোড্রোমটি বর্তমান যুগে কলিকাতা শহরের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন। বেলগাছিয়ায় কয়েকটি কাচ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। খালপারের পূর্বাংশ দেখিতে ত্রিভুজাকৃতি এবং সম্পুর্ণরূপে খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার পশ্চিমে সার্কুলার খাল, পূর্বে নূতন খাল ও দক্ষিণে বেলেঘাটা খাল। খালগুলির বর্তমান অবস্থা মোটেই ভাল নহে; নূতন খালটি কচুরীপানায়

ভরিয়া আসিতেছে। ইহাদের সংস্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এবং খালের দুই পার্শ্ব পরিষ্কার করিয়া এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সার্কুলার ও বেলেঘাটা খালের দুই পার্শ্বের রাস্তাকে আরও প্রশস্ত করা এবং নূতন খালের ধারে একটি নূতন রাস্তা নির্মাণ করাও আবশ্যক। ইহার মধ্য দিয়া চারিটি বড় বড় রাস্তা কলিকাতার পূর্ব সীমানা পর্যন্ত গিয়া, নূতন খালের উপর কোন পুল না থাকায়, থামিয়া গিয়াছে। কলকারখানা স্থাপনের পক্ষে এই অঞ্চল বিশেষ উপযোগী, বহু কলকারখানা ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্টাডাঙ্গায় অবস্থিত বেঙ্গল সিল্ক মিল্‌স্‌, লিলি বিস্কুট ফ্যাক্টরী, নিউ ইণ্ডিয়ান ও ইন্টারন্যাশনাল গ্লাস ওয়ার্কস, ভট্টাচার্য কোম্পানীর করাতকল; মাণিকতলা মেন রোডে অবস্থিত বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল, বেঙ্গল মিসলেনি এবং সন্তোষ বিস্কুট ফ্যাক্টরী; নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোডের উপর অবস্থিত সুঁড়ো জুট মিল্‌স্‌ ও ক্যালকাটা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী; এবং বেলেঘাটা মেন রোডের উপর অবস্থিত লক্ষ্মী জুট মিল্‌স্‌ ও গডফ্রে ফিলিপসের সিগারেট ফ্যাক্টরী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এছাড়া উল্টাডাঙ্গায় খালের ধারে বহু চালের কল, এবং অন্যত্র সাবান, দিয়াশলাই, কাচের দ্রব্য, ও সার নির্মাণের কারখানা এবং গেঞ্জির কল দেখা যায়। এই অঞ্চল উন্নয়নের এক ব্যাপক পরিকল্পনা কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। অদূর

ভবিষ্যতে মাণিকতলা বেলেঘাটা খালপার অঞ্চল যে কলিকাতার এক সুন্দর শহরতলীতে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

খালপারে লোকের বাস কলিকাতার তুলনায় খুবই কম; প্রতি একরে ৪৭ হইতে ৬৬। বাড়ীর সংখ্যাও বেশী নহে, প্রতি একরে মাত্র ৯ হইতে ১৫। আয়তনে সমগ্র কলিকাতার ইহা এক পঞ্চমাংশ হইলেও কলিকাতার লোক সংখ্যার মাত্র এক অষ্টমাংশ এখানে বাস করে। অবশ্য যুদ্ধের পর লোক-সংখ্যা কলিকাতার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেশনকার্ড অনুযায়ী ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলের চারিটি থানায়— কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা, লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬ লক্ষ; ১৯৪১ সালে আদম-সুমারীর গণনা অনুযায়ী এখানকার পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের—কাশীপুর, সাতপুকুর, বেলগাছিয়া, মাণিকতলা ও বেলিয়াঘাটার, লোকসংখ্যা ছিল ২½ লক্ষের কিছু বেশী।

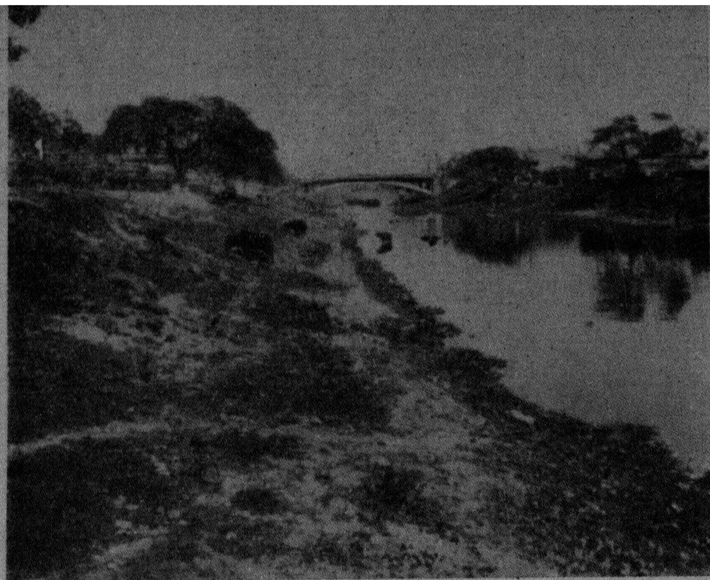
(২) উত্তর কলিকাতা

কলিকাতা বলিতে সাধারণত উত্তর কলিকাতাই বোঝায়। আয়তনে ইহা খালপারের অর্ধেক হইলেও লোকসংখ্যায় প্রায় চতুর্গুণ (১৯৪১ সালের আদমসুমারীর গণনা অনুযায়ী)। গত আট বৎসরে ইহার লোকসংখ্যা আরও এক লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তরে বাগবাজার হইতে দক্ষিণে বৌবাজার পর্যন্ত উত্তর কলিকাতা বিস্তৃত। ইহা ৯টি

ফটোচিত্র ৫৫—উত্তর খালপারে টালার জলের ট্যাঙ্ক (পৃষ্ঠা ১৫৫)



ফটোচিত্র ৫৬—পূর্ব খালপারে বর্মাশেলের তেলের ট্যাঙ্ক (পৃষ্ঠা ১৬৩



ফটোচিত্র ৫৭—উত্তর কলিকাতার পূর্ব সীমানা দিয়া প্রবাহিত খাল (পৃষ্ঠা ১৫৭)

ফটোচিত্র ৫৮—শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ পাঁচমাথা (পৃষ্ঠা ১৬০)

বসু এভিনিউ)—এই পাঁচটি প্রশস্ত রাস্তা কলিকাতাকে ইহার বিভিন্ন অংশের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ছাড়া আর চারটিই নূতন করিয়া কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। ভূপেন বসু এভিনিউ পশ্চিম দিকে গিয়া উত্তর কলিকাতার সব চেয়ে সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে পড়িয়াছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ উত্তরে রমাকান্ত বসু ষ্ট্রীট হইতে দক্ষিণে এসপ্লানেড পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঙ্গালী পল্লীর ভিতর দিয়া যাইলেও ইহার দুই পার্শ্বে নূতন ধনী মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের প্রাসাদোপম বড় বড় অট্টালিকা দেখা যায়। উত্তর কলিকাতায় এই রাস্তাটির উপর স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটুট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ্ এর হাসপাতাল ও গবেষণাগার অবস্থিত। এই রাস্তার উপর দুইটি প্রসিদ্ধ পার্ক আছে—একটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে—মহম্মদ আলি পার্ক, আর একটি হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে—গিরীশ পার্ক। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর পূর্বদিকে অবস্থিত উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত কলিকাতার অন্যতম প্রধান রাজপথ—কর্ণওয়ালিশ-কলেজ ষ্ট্রীটে ট্রামে বাসে খুব বেশী ভীড় হয়, যদিও অনবরত ট্রাম বাস এই পথে চলাচল করে। ইহারই উপর বা আশে পাশে কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ থিয়েটার ও সিনেমা হাউস এবং স্কুল ও কলেজ থাকায় কলিকাতার ভিন্ন পাড়ার বহু লোকেরা এই পথে যাতায়াত করে। রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত দুইটি স্কোয়ার—হেদুয়া (আজাদ হিন্দ্ বাগ) ও গোলদীঘি, (কলেজ স্কোয়ার) স্থানীয় অধিবাসীদের বেড়াইবার ও সাঁতার

কাটিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। এই দুইটি উন্মুক্ত স্থানের সহিত স্বদেশী আন্দোলনের বহু স্মৃতি বিজড়িত। গোলদীঘির নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু ও হেয়ার স্কুল প্রভৃতি বিদ্যায়তন থাকায় এই অংশের নাম রাখা হইয়াছে কলেজ ষ্ট্রীট। ঠনঠনে কালীবাড়ীর কিছু উত্তরে বিদ্যাসাগর কলেজ ও উইমেন্স্ কলেজ এবং হেদুয়ার পূর্ব পার্শ্বে স্কটিশ চার্চ ও পশ্চিম পার্শ্বে বেথুন কলেজ অবস্থিত। এত অধিক সংখ্যায় স্কুল কলেজ থাকার জন্যই গোলদীঘি অঞ্চল পুস্তক বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বর্ষাকালে কোন কোন দিন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে কলেজ ষ্ট্রীটে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে, জল দাঁড়াইয়া যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

খাস কলিকাতার পূর্ব সীমানা বরাবর আর একটি প্রধান রাজপথ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত। ইহার উত্তরাংশের নাম আপার সার্কুলার রোড। মারাঠা আক্রমণ হইতে নিজেদের জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া একটি পরিখা খনন করান, তাহারই পার্শ্বে ঐ পরিখার মাটি হইতেই সার্কুলার রোডের উৎপত্তি হয়। বহু দিন পর্যন্ত রাস্তাটি কাঁচা ছিল, পরে পাকা করা হয়। পরিখাটি বুঁজাইয়া দেওয়ার পর তাহার উপর ধীরে ধীরে বাড়ী উঠিতে থাকে; কিন্তু এখনও রাস্তার এই দিককার অধিকাংশ বাড়ীই কাঁচা, খোলার বা টিনের ছাদ দেওয়া।

আপার সার্কুলার রোডের পশ্চিমদিকে দুইটি প্রসিদ্ধ বিদ্যায়তন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ ও বসু বিজ্ঞান মন্দির, এবং শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটে ভিক্টোরিয়া কলেজ রহিয়াছে। পূর্বদিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন রায় লাইব্রেরী ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া সাহিত্য-পরিষদ ষ্ট্রীট আপার সার্কুলার রোডকে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটের দুই পার্শ্বে এবং নিকটবর্তী ডালিমতলা লেনে দুগ্ধবতী গরু ও মহিষের একটি বড় খাটাল দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গরুগুলি যে অযত্নে আছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। সুখের বিষয়, পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় শীঘ্রই শহরের খাটালগুলি হরিণঘাটায় স্থানান্তরিত হইবে। এই অঞ্চলে কয়েকটি তেলের ও ময়দার কল দেখা যায়। নিকটেই গোয়াবাগানের খোলাঘরের বস্তী অঞ্চল। কলিকাতায় সর্বশুদ্ধ এইরূপ ৪৯৪০ বস্তী আছে। পৃথিবীর অন্য কোন বড় শহরে মানুষ এরূপ নিকৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে বাস করে না। কেশব সেন ষ্ট্রীট ও আপার সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে মুসলমান প্রধান রাজাবাজার অঞ্চল; এখানেও কয়েকটি বস্তী দেখা যায়। রাজাবাজারের পূর্বদিকে প্রশস্ত গ্যাস ষ্ট্রীট খালের ধার পর্যন্ত গিয়াছে; খালের ধারে এই রাস্তার উপর ওরিয়েণ্টাল গ্যাস ওয়ার্কস অবস্থিত; সামনেই খালের উপর নারিকেলডাঙ্গার পুল থাকায় খালের অপর পার হইতে কারখানার শ্রমিকেরা অনায়াসে আসা

যাওয়া করিতে পারে। আর একটু দক্ষিণে খালের অপর পারে বর্মা শেল কোম্পানীর তেলের বড় বড় ট্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান রেলপথটিও গড়ের পূর্বদিক পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, সেইজন্যই শিয়ালদহ ষ্টেশন কলিকাতার এক প্রান্তে অবস্থিত। অবশ্য যে জমির উপর ষ্টেশনটি নির্মিত হইয়াছে তাহা আশ-পাশের জমি অপেক্ষা উঁচু। পুরাতন পরিখা ও বর্তমান সার্কুলার খালের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে অনেক পরে বসতি স্থাপিত হয়; ইহার এক অংশ এখনও গড়পার নামে পরিচিত। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট গড়পারের প্রধান রাজপথ। ইহাও উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট যেখানে আরম্ভ, তাহারই নিকট উত্তর কলিকাতার সব চেয়ে বড় উন্মুক্ত স্থান—দেশবন্ধু পার্ক অবস্থিত। এই রাস্তার পূর্বদিকে একটি ছোট রাস্তার উপর (বদ্রিদাস টেম্পল রোড) জৈনদের বিখ্যাত পরেশনাথের মন্দির আছে। আপার সার্কুলার রোডের উপর মাণিকতলার বাজার ও রাজাবাজার এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর বৈঠকখানার বাজার সুপ্রসিদ্ধ। 'বৈঠকখানা' নামটি কলিকাতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কারণ এই বৈঠকখানার অর্থাৎ প্রাচীনকালের ব্যবসায়ীদের প্রিয় বটবৃক্ষতলে বসিয়া কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক কলিকাতাকে গড়িয়া তুলিতে সঙ্কল্প করেন। আপার সার্কুলার রোড ও কর্ণওয়ালিশ-কলেজ ষ্ট্রীটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশের মধ্যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত কলিকাতার আর দুইটি

প্রধান কলেজ—সিটি ও সেণ্টপল্‌স্‌ এবং দুইটি হাসপাতাল—মারোয়াড়ী ও লেডি ডাফরিণ কলিকাতার রাস্তার অসম্ভব গোলমালের হাত হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আমহার্ষ্ট ও মির্জাপুর ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে অবস্থিত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বৈঠকখানা অঞ্চলের অধিবাসীরা খেলাধূলাও সভাসমিতি করিয়া থাকেন।

উত্তর কলিকাতায় পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলির মধ্যে হ্যারিসন রোডই প্রধান। ইহা কলিকাতার তথা ভারতের দুইটি প্রধান রেল ষ্টেশনকে (হাওড়া ও শিয়ালদহ) যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বহু আঁকা-বাঁকা রাস্তাকে সোজা করিয়া ৭৫ ফুট চওড়া এই রাস্তাটি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এই রাস্তাটি কলিকাতার একটি প্রধান ব্যবসায় অঞ্চল—বড়বাজারের মধ্য দিয়া যাওয়ায় ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারই পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার উপরে নূতন প্রশস্ত সুউচ্চ ক্যান্টিলিভার হাওড়ার পুল বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত বিবেকানন্দ রোড কলিকাতার একমাত্র কংক্রিটের রাস্তা; এবং ভারী লরী চলিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযুক্ত। কলিকাতার খালপারের শিল্পাঞ্চলের সহিত প্রধানত এই রাস্তাটি কলিকাতার অন্যান্য অংশকে যুক্ত রাখিয়াছে। বিবেকানন্দ রোডের উত্তরে আর দুইটি রাস্তা—বিডন ষ্ট্রীট ও গ্রে ষ্ট্রীট এবং দক্ষিণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট পূর্ব হইতে পশ্চিমে যানবাহন চলাচলের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। উত্তর

কলিকাতার ছাপাখানাগুলির মধ্যে বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রেস, আপার সার্কুলার রোডে প্রবাসী প্রেস, বৌবাজারে বসুমতী প্রেস, এবং বর্মণ ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রেস উল্লেখযোগ্য। বৌবাজার ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশে কাঠের আসবাবপত্রের দোকান ও চীনাদের জুতার দোকান, এবং পূর্বাংশে বড় বড় জুয়েলারীর দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। মির্জাপুর ষ্ট্রীটের পশ্চিমে কলুটোলা ষ্ট্রীটে মনোহারী ও কাঁচের জিনিষের পাইকারী বহু দোকান আছে; কলিকাতার ও পূর্ব ভারতের খুচরা দোকানের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি এখান হইতে ক্রয় করা হইয়া থাকে।

(৩) লালদীঘি অঞ্চল

এই অঞ্চলটি মোটামুটি উত্তরে হ্যারিসন রোড, দক্ষিণে অকল্যাণ্ড-লরেন্স-অক্টারলোনি রোড, পূর্বে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট-লোয়ার চিৎপুর রোড ও পশ্চিমে গঙ্গার দ্বারা পরিবেষ্টিত। লালদীঘির অপর নাম ডালহৌসী স্কোয়ার। এই অঞ্চলটি কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এখানে যাবতীয় বড় বড় ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী আফিস থাকায় দিনের বেলায় উহা কর্মমুখরিত হইয়া উঠে, এবং রাত্রিকালে নির্জন হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের সদর দপ্তরখানা (রাইটার্স বিল্ডিং) লালদীঘির উত্তর দিকে অবস্থিত; ইহার নিকটেই লালবাজারে কলিকাতা পুলিশের সদর-দপ্তর। লালদীঘির দক্ষিণে—সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস, পশ্চিমে জেনারেল পোষ্ট আফিস এবং পূর্বদিকে

কলিকাতার এই অংশে অবস্থিত বহু মসজিদ ও গির্জা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান বা ক্রীশ্চান। লোয়ার সার্কুলার রোডের পূর্ব দিকের খোলা জমিতে, অর্থাৎ পূর্বতন মারাঠা পরিখার অপর পারে, অনেকটা স্থান জুড়িয়া ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ, মৌলালি দরগাহ্, এণ্টালী বাজার, জোড়াগির্জা এবং একটি বড় গোরস্থান নির্মাণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই গোরস্থানেই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেহ সমাহিত করা হইয়াছিল। তাঁহার সমাধির উপর শ্বেত মর্মর রচিত স্মৃতিস্তম্ভ আছে। লোয়ার সার্কুলার রোডে কয়েকটি বড় বড় মোটর মেরামতির কারখানা ও একটি বড় ছাপাখানা আছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে উহার সমান্তরালে ওয়েলিংটন—ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট বৌবাজার হইতে পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উত্তর কলিকাতার সহিত যুক্ত রহিয়াছে। উত্তর কলিকাতা হইতে আগত যানবাহনাদি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দিয়া আসিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; এক ভাগ পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া যায় আর এক ভাগ সোজা ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া পূর্ব দিকে বাঁকিয়া যায় এবং লোয়ার সার্কুলার রোডে গিয়া পড়ে। ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের উপর কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজ (পূর্বতন ইস্‌লামিয়া কলেজ) ও একটি মাদ্রাসা অবস্থিত। মাদ্রাসার দক্ষিণে ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মতলা ষ্ট্রীটের পূর্বাংশে ছোট ছোট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা আছে;

এবং ইহা হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে ; বৌবাজার ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে বৌবাজারের দৈনিক বাজার এবং ওয়েলিংটন ও ধর্মতলার মোড়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বহু লোকের সমাগম হয়। এই অঞ্চলের পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তা গুলির মধ্যে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড (পূর্বতন করপোরেশন ষ্ট্রীট) প্রধান। প্রথমোক্ত রাস্তাটির দুই পার্শ্বে সাজান বড় বড় দোকান, চাঁদনী চকের বাজার, সিনেমা হাউস প্রভৃতি জনপ্রিয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ইহুদী ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বসবাস বেশী। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। কলিকাতার প্রায় ৪০০ মাইল পাকা রাস্তা, প্রায় ৩০০ মাইল ভূগর্ভস্থ ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেণ, প্রায় ৬০০ মাইল লম্বা পরিশ্রুত জল সরবরাহের পাইপ, এবং ৪০০ মাইল লম্বা অপরিশ্রুত জল সরবরাহের পাইপ তদারকের ভার কলিকাতা করপোরেশনের হাতে ন্যস্ত আছে। এ ছাড়া, কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা হইতে আবর্জনার স্তূপ সরান, গোরস্থান ও শ্মশানঘাটের তদারক, প্রত্যহ অন্যূন ৭ কোটি গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ, অবৈতনিক ২৩৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি বহুবিধ কার্যে কলিকাতা করপোরেশনের অধীন ২৬,৫০০ নিম্নপদস্থ কর্মচারী ১৬,০০০ ঝাড়ুদার ও মেথর, ৩,০০০ পিওন, বাতিওয়ালা, এবং ৪,৫০০ অধস্তন কেরাণী শ্রেণীভুক্ত কর্মী নিযুক্ত আছে। এই

পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকায় নির্মিত প্রায় চার লক্ষ বাড়ী হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়া উপরোক্ত জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হয়। কলিকাতা করপোরেশনের বাৎসরিক মোট আয় প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এবং ব্যয় প্রায় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। কলিকাতা সহরের বিরাটত্বের প্রমাণ ইহা হইতে কিছু পাওয়া যায়।

লোয়ার সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে আর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মধ্য কলিকাতার অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই অঞ্চল তিনটি ওয়ার্ডে—এণ্টালী, ট্যাংরা ও বেনিয়াপুকুর—বিভক্ত। ইহার আয়তন ১,৮৪৫ একর ও লোকসংখ্যা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২ লক্ষ ছিল; এখন (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে) লোকসংখ্যা বাড়িয়া প্রায় ৩ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত জনবিরল এই শহরতলীর সম্যক উন্নয়ন করিতে পারিলে কলিকাতার গৃহসমস্যার কতক সমাধান হইতে পারে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণ প্রান্তে পরিকল্পনামত নূতন নূতন প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তের নূতন রাস্তাগুলি পার্ক সার্কাসে আসিয়া মিলিত হইয়াছে; এইরূপ একটি রাস্তা, সরওয়ার্দ্দি এভিনিউর উপর লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজ অবস্থিত। ইহারই সামনে খেলাধূলার জন্য এক বিরাট পার্ক রহিয়াছে। গোরাচাঁদ রোডের উপর চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল ও কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পার্ক সার্কাসকে ঘিরিয়া বহু ফ্ল্যাটযুক্ত সুউচ্চ পার্ক প্যালেস,

মেরিনা কোর্ট প্রভৃতি অট্টালিকাগুলি দাঁড়াইয়া ঐ স্থানের প্রাধান্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

খালপারের মত এই অঞ্চলেও বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ট্যাংরা, কনভেণ্ট, ও মিডল রোডে কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণের বড় বড় কারখানা আছে; ইহাদের মধ্যে ম্যানফিল্ড কোম্পানীর ও ল্যাজারসের কারখানা প্রধান। ট্যাংরা রোডে অবস্থিত বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কসে প্রতিদিন অন্তত দুই সহস্র শ্রমিক কার্য করে। ট্যাংরা ও চিংড়ীঘাটা রোডে রবারের দ্রব্যাদি নির্মাণের কয়েকটি বড় বড় কারখানা আছে; ইহাদের মধ্যে এ, কে, সরকারের কারখানাটি সবচেয়ে বড়। এণ্টালীর আনন্দপালিত ও কনভেণ্ট রোডে রাসায়নিক দ্রব্যাদি নির্মাণের কয়েকটি কারখানা, এবং ক্যানাল সাউথ রোডে বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটুট ও ন্যাশনাল ট্যানারীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ট্যাংরায় ও বেনিয়াপুকুরে আরও কয়েকটি ট্যানারী আছে। এ ছাড়া বহু বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। মিডল রোডে স্থুর এনামেল ওয়ার্কসে দৈনিক অন্তত দুই সহস্র শ্রমিক কার্যে নিযুক্ত আছে। সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে গোবরা রোডের গ্রেশাম ও ক্রাভেন কোম্পানী ও কনভেণ্ট রোডের স্যাক্সবি-ফার্মার ওয়ার্কস প্রধান। মিডল রোডে অবস্থিত নরটন কোম্পানীর ঢালাইর কারখানা, এবং কনভেণ্ট রোডে করপোরেশনের কারখানাতেও বহু শ্রমিক কাজ করে। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে ডাক্তার

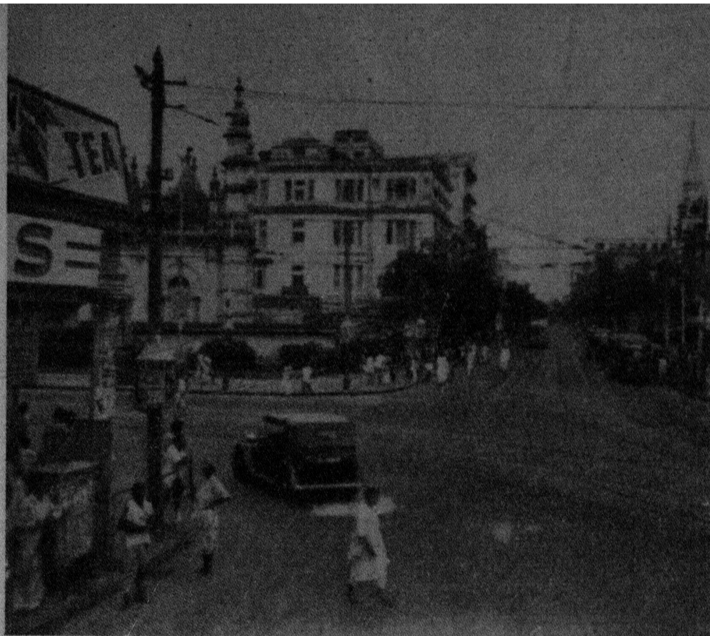
সুরেশ সরকার রোডে অবস্থিত ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস প্রধান ; এই প্রতিষ্ঠানে দৈনিক প্রায় ৬০০ শ্রমিক কাজ করে।

(৫) চৌরঙ্গী

এই অঞ্চল কলিকাতার বর্তমান 'ওয়েষ্ট এণ্ড', যদিও ইংরাজদের কলিকাতায় আসার পরে ইহা শহরের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার পশ্চিমে কলিকাতার বিখ্যাত চৌরঙ্গী রোড এবং দক্ষিণ দিকে লোয়ার সার্কুলার রোড অবস্থিত। চৌরঙ্গী রোডের সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান থাকায় ইহার সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বহু হোটেল-গ্র্যাণ্ড, কন্‌টিনেণ্টাল ইত্যাদি ও সিনেমা হাউস—মেট্রো, লাইট হাউস এবং সর্বাধিক সুসজ্জিত বিপণিগুলি, হোয়াইটএওয়ে, আর্মি-নেভি ষ্টোরস ইত্যাদি এই রাস্তারই উপর বা আশেপাশে অবস্থিত ; ইহারা রাত্রিকালে লাল নীল প্রভৃতি বহু রংয়ের আলোক মালায় ভূষিত হইয়া অপূর্ব রূপ ধারণ করে। এই রাস্তার উপরই কলিকাতা মিউজিয়ম (যাদুঘর) রহিয়াছে। ভারতের মধ্যে এত বড় ও এরূপ বিভিন্ন দ্রব্যে পরিপূর্ণ মিউজিয়ম আর নাই। জিয়লজিকাল সার্ভে অফিস ও গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলও এইখানে অবস্থিত।

চৌরঙ্গী রোড হইতে পূর্বদিকে প্রসারিত লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের উপর নিউমার্কেট (হগসাহেবের বাজার) অবস্থিত। কলিকাতায় এত বড় ও এরূপ সাজান বাজার আর একটিও নাই। চৌরঙ্গী রোড ও ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে

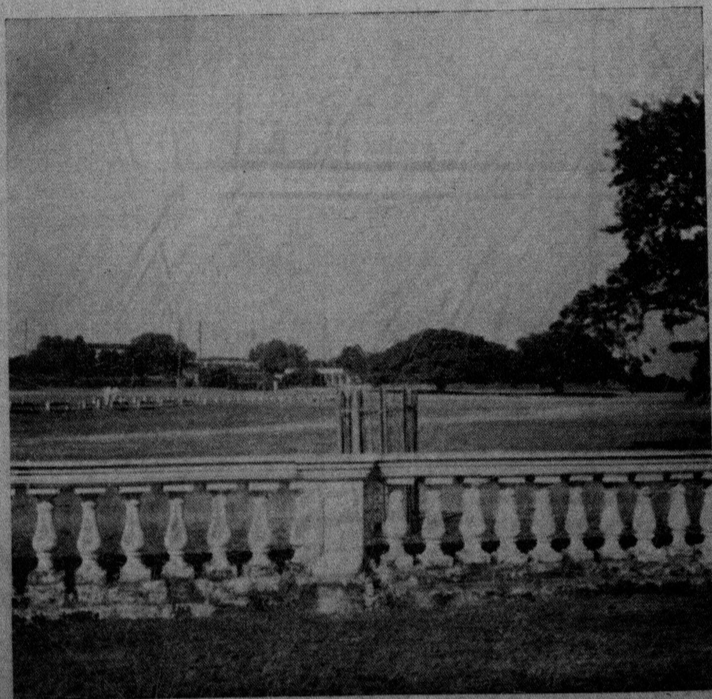
ধর্মতলায় টিপুসুলতানের মসজিদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ধর্মতলা ষ্ট্রীটের অপরদিকে সেণ্টহার্ট গির্জা অবস্থিত। চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের দক্ষিণ হইতে চৌরঙ্গী অঞ্চল পূর্বদিকে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত; ইহার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানা ধরিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডের যে অংশ গিয়াছে, তাহা লোয়ার বা আপার সার্কুলার রোডের অন্যান্য অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক; এই অংশে রাস্তাটি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং তরু-বীথি শোভিত। রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রত্যেক বাড়ীগুলির সংলগ্ন বাগান আছে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া থিয়েটার রোড পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত; এই রাস্তাটিও প্রশস্ত। ফুটপাথের ধারে ধারে ফুলগাছ ইহার সৌন্দর্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এবং রাস্তার দুই পাশের সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি বাগানে ঢাকা। চৌরঙ্গীর প্রত্যেক রাস্তাই সুন্দর। ক্যামাক ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যবর্তী অংশে করপোরেশনের কয়েকটি বাগান ও তৎসংলগ্ন দীঘি থাকায় এই অঞ্চলটি আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পার্ক ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ভবন ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির দুইটি প্রধান কেন্দ্র। উড ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার আফিস, কারখানা ও ছাপাখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এইখানেই ভারতের বিভিন্ন স্থানের মানচিত্র ছাপা হয় এবং ম্যাথমেটিক্যাল ইনষ্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে দুই সহস্রের বেশী শ্রমিক কাজ করে।



ফটোচিত্র ৫৯—চৌরঙ্গীর চৌমাথা

ফটোচিত্র ৬০—চৌরঙ্গী রোডের উপর বড় বড় হোটেল ও দোকান

ফটোচিত্র ৬১—ময়দানের উপর অক্টারলোনি মনুমেণ্ট



(৬) গড়ের মাঠ বা ময়দান

চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম হইতে গঙ্গার তীর পর্যন্ত ১,২৮৩ একর জমির উপর কলিকাতার বিখ্যাত ময়দান ও দুর্গ অবস্থিত। নদীতীরে এত বড় উন্মুক্ত ও উন্নত প্রান্তর পৃথিবীর আর কোন শহরের সহিত সংযুক্ত হইয়া নাই। কলিকাতার অধিবাসীদের ইহা অতি প্রিয় ভূমি। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাধূলার বহু ক্লাব ময়দানের ইতস্তত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ক্লাবগুলির মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব; মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডন স্পোর্টিংএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মাঠ আছে। খেলার মাঠে প্রতিদিনই সহস্র সহস্র ক্রীড়ামোদীদের সমাবেশ হয়, এবং যখন কোন বিশেষ খেলা থাকে তখন ইহা একটি জন সমুদ্রে পরিণত হয়। মোটরে বা পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবার জন্যও কলিকাতার প্রায় অর্ধেক লোক বৈকালের দিকে, বিশেষত ছুটির দিনে গড়ের মাঠে আসিয়া সমবেত হন, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। গড়ের মাঠে অবস্থিত ১৫২ ফুট উচ্চ অক্টারলোনি মনুমেণ্ট বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মনুমেণ্টের পাদদেশে প্রায় প্রত্যহ বৈকালে বহু লোক মিলিয়া রাজনৈতিক মিটিং করিতেছে দেখা যায়। ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে বর্তমান দুর্গটি অবস্থিত। নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত প্রথম যুদ্ধে ইংরাজদের হার হয় এবং সে সময় পুরাতন দুর্গটি

ধ্বংস হইয়া যায়। পরে নূতন দুর্গ স্থাপনের প্রশ্ন উঠিলে বর্তমান স্থানটি ঠিক করা হয়। তখন এই অঞ্চলে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল ; গ্রামের অধিবাসীদের উঠাইয়া দিয়া দুর্গের পত্তন হয়। গোবিন্দপুর ও তদানীন্তনকালের চেরাঙ্গী গ্রামে ব্যাঘ্র সমাকুল ভীষণ জঙ্গল ও জলা ছিল, এবং সেখানে খুনে ডাকাত-দের বহু আড্ডা থাকার কথাও শোনা যায়। সেই ভীষণ জঙ্গলই ইংরাজের যাদুমন্ত্রে আজ নন্দন কাননে রূপান্তরিত হইয়াছে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান দুর্গটির নির্মাণকার্য শেষ হয়, এবং তখনকার ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামানু-সারে ইহার নাম রাখা হয় 'ফোর্ট উইলিয়ম'। এই দুর্গটির আটটি কোণ আছে, এবং চারিদিকে ঢালু মৃত্তিকার প্রাচীর থাকায় ইহা বাহির হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। দুর্গের পূর্ব দিকে রেডরোড ও পশ্চিমে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। শেষোক্ত রাস্তা হইতে দুর্গের বাহিরের পরিখা দেখিতে পাওয়া যায়। রেড রোডের মত এত সুন্দর ও প্রশস্ত রাজপথ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। যুদ্ধের সময় এই রাস্তায় উড়োজাহাজ উঠানামা করিত। রেড রোড হইতে দুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বার-পলাশী গেটে যাইতে হয়। ময়দানের উত্তর-পশ্চিমে ইডেন গার্ডেনে প্রায়ই কোন না কোন প্রদর্শনী দেখান হয়। ময়দানের দক্ষিণে শ্বেতমর্মররচিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ সৌধ। ইহার সংলগ্ন সুরম্য উদ্যানের মত বেড়াইবার স্থান কলিকাতায় উপস্থিত আর একটিও নাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পশ্চিম দিকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঘোড়-

করা হইয়াছে। রাসবিহারী এভিনিউ রসারোড হইতে বাহির হইয়া পূর্ব দিকে বালীগঞ্জ রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রেল ষ্টেসনের কাছে বেশ জমজমে ভাব; ছোট্ট একটু ত্রিভুজাকৃতি পার্কের চারিদিকে একের পর এক ট্রাম ঘুরিয়া যাইতেছে; এবং বাসও এখান পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইতেছে।

রাসবিহারী এভিনিউর দুই প্রান্তে দক্ষিণ কলিকাতার দুইটি প্রধান বাজার অবস্থিত; রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলের নিকটে লেক মার্কেট, এবং গড়িয়াহাট ও রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে গড়িয়াহাট মার্কেট। গড়িয়াহাট মার্কেট অঞ্চল দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্ররূপে দ্রুত পরিণত হইতেছে; এখানে কলিকাতার কয়েকটি ব্যাঙ্কের ও অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হইয়াছে।

রাসবিহারী এভিনিউ, সাদার্ণ এভিনিউ এবং এই রাস্তা দুইটির সন্নিহিত অঞ্চল কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক যেরূপ নিখুঁত ভাবে উন্নয়ন করা হইয়াছে, কলিকাতা বা শহরতলির অন্য কোন অংশ সেভাবে এখনও পর্যন্ত উন্নয়ন করা হয় নাই। উত্তর কলিকাতার যে কোন রাস্তার সহিত দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী এভিনিউ অঞ্চলের যে কোন একটি রাস্তার তুলনা করিলে ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উত্তর কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট একটি বিশিষ্ট রাজপথ, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; ট্রাম, বাস ও অন্যান্য যান বাহন এই রাস্তার মাঝখান দিয়া যাতায়াত করে বলিয়া রাস্তায় সময় সময়

অসম্ভব ভীড় হয়; বর্ষাকালে আবার কোন কোন দিন রাস্তায় জল জমিয়া যাওয়ায় ট্রাম বন্ধ হইয়া যায়। অপর পক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় রসারোড ও সাদার্ণ এভিনিউ কত প্রশস্ত ও সুন্দর! রাস্তার এক পাশে বাস এবং অপর পাশে ট্রাম চলাচল করে; পথের মাঝখানে ফুটপাথও আছে; এরূপ প্রশস্ত রাস্তায় কখনও ভীড় হয় না এবং বৃষ্টির জলও জমিতে পারে না; ফুটপাথের ধারে ও মাঝে সযত্নে রোপিত গাছগুলি রাস্তার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তস্থ জলাভূমিকে সংস্কার করিয়া স্থানটিকে মনোরম হ্রদপরিবেষ্টিত এক প্রমোদ কাননে পরিণত করা হইয়াছে। এখানকার কৃত্রিম হ্রদগুলিই ঢাকুরিয়ার বা বালীগঞ্জের লেক নামে পরিচিত।

পার্কসার্কাসের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাস্তাগুলিকেও নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ প্রধান। এই রাস্তাটির দক্ষিণাংশ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড ও গড়িয়াহাট রোড নামে পরিচিত। কলিকাতা হইতে বালীগঞ্জে পার্ক ষ্ট্রীটের ট্রামে যাইবার সময় ওল্ড বালীগঞ্জ রোডেই প্রথম দেখা যায় যে, রাস্তার মাঝখানে ঘাসের প্লটের উপর দিয়া ট্রাম যাইতেছে। ওল্ড বালীগঞ্জ রোডের নিকটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি বিজ্ঞান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস অবস্থিত।

রেল লাইন ছাড়াইয়া গড়িয়াহাট রোড সোজা দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছে। লাইনের অপরপারে খোলা ড্রেন ও

ফাঁকা মাঠ দেখিলেই বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলের এখনও সম্যক উন্নয়ন করা হয় নাই। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর কলটিভেশন অব সায়ান্স, সেণ্ট্রাল গ্লাস ও সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটুট—নূতন বাড়ী উঠিতেছে। উত্তর কলিকাতায় যেমন দেশবন্ধু পার্ক, দক্ষিণ কলিকাতায় তেমনি দেশপ্রিয় পার্কে রাজনৈতিক সভাসমিতি লাগিয়াই আছে। এই পার্কটি রাসবিহারী এভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগ স্থলে অবস্থিত।

আশুতোষ মুখার্জী রোডের পশ্চিমদিকে হরিশ মুখার্জী রোড ও পূর্বদিকে ল্যান্সডাউন রোড ভবানীপুরের উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত অপর দুইটি প্রশস্ত রাজপথ। হরিশ মুখার্জী রোডের উপর হরিশ পার্ক এবং ল্যান্সডাউন রোডের উপর ল্যান্সডাউন স্কোয়ার অবস্থিত। এই দুইটি রাস্তার উপর দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্কুল দেখা যায়। ল্যান্স-ডাউন রোড ও রমেশ মিত্র রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত ল্যান্সডাউন মার্কেট দক্ষিণ কলিকাতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বাজার।

পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলির মধ্যে হাজরা রোড, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট-এলগিন রোড, পদ্মপুকুর রোড ও রমেশমিত্র রোড প্রধান। দ্বিতীয় রাস্তাটির উপর দক্ষিণ কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ হাসপাতাল অবস্থিত। ল্যান্সডাউন রোডের পূর্ব দিকে আর একটি রাস্তা উত্তর হইতে দক্ষিণে গিয়াছে—বালীগঞ্জ সার্কুলার—রিচি রোড; এই রাস্তার উপর

ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ অবস্থিত। বালীগঞ্জ সাকুর্লার রোডের পূর্বদিকে বালীগঞ্জ ময়দান ; ইহার সম্যক উন্নয়ন হইলে দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

সম্প্রতি বালীগঞ্জে ও সন্নিহিত অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রিন্স আনওয়ার শা রোডে জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস, সুইনহো ষ্ট্রীটে ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল কোম্পানী, জষ্টিস চন্দ্রমাধব রোডে ফোর্ড কোম্পানীর কারখানা, হাজরা রোডে এলেনবেরির মোটর মেরামতির কারখানা, এবং দিহী শ্রীরামপুরে ম্যাকিণ্টশ বার্ণ কোম্পানীর কারখানা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আদিগঙ্গার পশ্চিমে আলিপুর অবস্থিত। আলিপুরে লোকের বসবাস কম ; ইহা ২৪ পরগণা জেলার সদর শহর। এখানে প্রাক্তন বড়লাট প্রাসাদে—বেলভিডিয়ার, সম্প্রতি ভারতীয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানা ও আবহাওয়া আফিস উল্লেখযোগ্য। আলিপুরে পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলির মধ্যে জজেস কোর্ট রোড প্রধান। এই রাস্তার একদিকে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের এ্যাণ্ডারসন হাউস এবং অপরদিকে বেঙ্গল সার্ভে আফিস ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস রহিয়াছে। এ ছাড়া আরও অনেক সরকারী ভবন—প্রেসিডেন্সি জেল, সেণ্ট্রাল জেল, পুলিশ হাসপাতাল, মিলিটারি হাতপাতাল, পুলিশ ট্রেণিং স্কুল, আদালত, রিফরমেটরি, হেষ্টিংস হাউস ইত্যাদি আলীপুরের অধিকাংশ স্থানঅ ধিকার করিয়া আছে। কলিকাতার অন্য

কোন অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যায় সরকারী ভবন দেখা যায় না।

বালীগঞ্জের দক্ষিণে টালীগঞ্জে এবং আলীপুরের দক্ষিণে চেতলায়, সাহাপুরে ও ইটালঘাটায় প্রায় ৪০টি চালের কল আছে। টালীগঞ্জ গল্‌ফ্‌ খেলার একটি প্রধান কেন্দ্র।

ফোর্ট উইলিয়ামের পশ্চিম গা ঘেঁসিয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে সরকারী ও আধা-সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের একটি কলোনী দেখা যায়। ইহাই হেষ্টিংস্‌ অঞ্চল; এখানকার বাড়ী ও রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন বাগান এই অঞ্চলটিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার বাড়ীগুলির মধ্যে ষ্ট্রাণ্ড-রোডের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত আধুনিকতম প্রথায় নির্মিত ‘মেরিন হাউস’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেষ্টিংসে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একটি বড় ছাপাখানা আছে। হেষ্টিংসের পশ্চিম প্রান্তে আদিগঙ্গা (টালীর নালা) গঙ্গা হইতে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; এবং হেষ্টিংস পুল পার হইয়া আর একটু পশ্চিমে অগ্রসর হইলে ঘন বসতিপূর্ণ খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ এলাকায় যাওয়া যায়। হেষ্টিংস পুলের সামনে পোর্টট্রাষ্টের রেল চলিবার একটি ঝুলান সেতু আছে। খিদিরপুর ডক অঞ্চলের বহু শ্রমিক ওয়াটগঞ্জ এলাকায় বাস করে। এ ছাড়া ওয়াটগঞ্জে কাপড়ের কল, ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপ ও জাহাজ মেরামতির কারখানা আছে।

ওয়াটগঞ্জের দক্ষিণে ঘনবসতিপূর্ণ খিদিরপুর অঞ্চল

অবস্থিত। খিদিরপুর পার হইয়া খিদিরপুর রোড দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; একটি পশ্চিম দিকে গিয়া সার্কুলার গার্ডেন রীচ নামে পরিচিত, অপরটি ডায়মণ্ডহারবার রোড নাম লইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই দুই রাস্তার সংযোগস্থলে খিদিরপুরের বিরাট বাজার অবস্থিত। খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজার গড় এই অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খিদিরপুর ডকের পশ্চিমে গার্ডেন রীচ অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলের নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে, গঙ্গার তীরে এক সময় এখানে বহু বাগানবাড়ী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বাড়ীগুলির অধিকাংশ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ক্রয় করিয়া লন। তাঁহার বংশ লুপ্ত হইয়া গেলে এই অঞ্চলটি আবার হস্তান্তরিত হয়। তখন এই অঞ্চলে বেঙ্গল নাগপুর রেলের প্রধান কার্য্যালয়, চটকল, ডক, সাবানের কারখানা, পাওয়ার হাউস প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

(৮) কলিকাতার বন্দর

কলিকাতা হইতে ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবার সময় কর্মচঞ্চল কলিকাতা বন্দরের সহিত প্রথম যথার্থ পরিচয় হয় আউটরাম ঘাটে। এই ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে সমুদ্রগামী দুই একটি জাহাজ প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। আর কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া প্রিন্সেপ ঘাটে আসিলে বহু সমুদ্রগামী জাহাজের সমাবেশ দেখা যায়;

অসংখ্য বজরা জাহাজগুলিকে সাধারণত ঘিরিয়া মাল ওঠা নামা কাজে সাহায্য করিয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার বন্দর উত্তরে কোন্নগর হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত ২১ মাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত। কলিকাতা পোর্ট-কমিশনারদের হস্তে এই বন্দর পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে। এই সঙ্ঘের অধীনে প্রায় ৩০,০০০ কর্মচারী বন্দর সংক্রান্ত কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। খিদিরপুরের ডক কলিকাতা বন্দরের প্রধান অংশ। খিদিরপুর শহরতলীর একটু পশ্চিমে খিদিরপুর ডক অঞ্চল আরম্ভ হইয়াছে। ডকের উপরে দুইটি সেতু আছে এবং ঐ দুইটির উপর দিয়া দুইটি প্রধান রাস্তা—সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড ও গার্ডেন রীচ রোড, পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। প্রথমোক্ত রাস্তাটির উত্তরে ১নং খিদিরপুরের ডকে ও দক্ষিণে ২নং ডকে সমুদ্রগামী বহু জাহাজ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। আর একটু পশ্চিমে কিং এডওয়ার্ড ডক। খিদিরপুরের ডকের চারিদিকে বড় বড় গুদাম আছে; কোনটিতে চা, কোনটিতে কয়লা, কোনটিতে চামড়া বা পাট রপ্তানির জন্য রাখা থাকে। আমদানী দ্রব্যাদি পৃথক গুদামে রাখা হয়। ১নং খিদিরপুরের ডক কয়েক কোটি টাকা অর্থ ব্যয় করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। সাধারণত গঙ্গার তীরে অবস্থিত জেটি গুলিতে মাল খালাস করিয়া জাহাজ একটি লকগেটের ভিতর দিয়া প্রথমে এক প্রশস্ত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট জলাশয়ের (Tidal Basin) মধ্যে প্রবেশ করে: ইহাতে জোয়ার ভাঁটা

খেলে এবং ইহার সহিত এমন তিনটি লম্বা ধরণের ডকের সংযোগ আছে, যাহা হইতে অনায়াসে জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ শুষ্ক ডকের (Dry Dock) মধ্যে চার হাজারের অনধিক টনের জাহাজ মেরামতির কাজ হইতেছে, দেখা যায়। টাইডাল বেসিনের পশ্চিম দিকে চা-রপ্তানির বড় বড় গুদাম আছে এবং পূর্ব দিকের বার্থে ভারী ভারী দ্রব্যাদি বিশেষ ধরণের ক্রেনের সাহায্যে নামান হয়। টাইডাল বেসিনের মধ্যে দিয়া জাহাজ প্রথমে ১নং ডকে ও পরে ২নং ডকের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

খিদিরপুরের ডকের পশ্চিমে কিংজর্জ্জ ডক ১৯২৯ সালে খোলা হয়। ইহা দক্ষিণ দিকে সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। গত যুদ্ধের সময় এই ডকটিকে আধুনিক প্রণালিতে সুসজ্জিত করা হয়। এখন বড় বড় জাহাজগুলি এই ডকের মধ্যেই আসাযাওয়া করে। আরও পশ্চিমে গার্ডেনরীচে কয়েকটি বার্থ আছে। সর্বশুদ্ধ খিদিরপুর ডকে ২৭টি, কিং জর্জ্জ ডকে বৃহদাকারের ৬টি ও অপেক্ষাকৃত ছোট ৮টি, গার্ডেনরীচে ৫টি এবং চিৎপুর হইতে তক্তাঘাট পর্যন্ত কলিকাতার গঙ্গার তীরে আর ৭টি বার্থ জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, কিং জর্জ ও খিদিরপুর ডকে জাহাজ মেরামতি ও রং করার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক জেটিতে ও ডকের বার্থে মাল তোলা বা নামানর জন্য বড় বড় ক্রেন (ভার উত্তোলন যন্ত্র) রাখা আছে। এ ছাড়া, মাল সহজে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বহু